সূ চী প ত্র

নববর্ষ সংখ্যা

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়

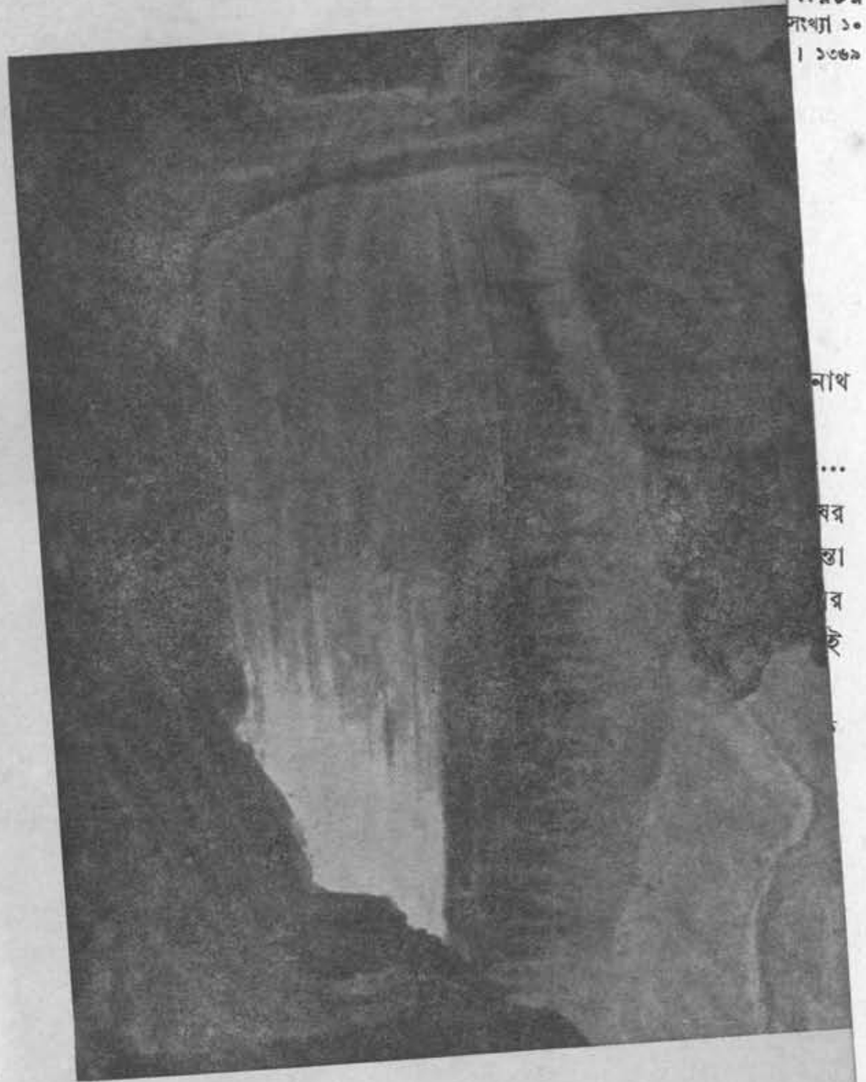
চিত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্কেচ : গোপাল ঘোষ

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচয়
বর্ষ ৩১। সংখ্যা ১০
বৈশাখ। ১৩৬৯

স্বদেশী সমাজের সাধনা

গোপাল হালদার

‘সোনার তরী’ পর্বের (১২৯৮—১৩০০ বঙ্গাব্দ) কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘রচনাবলী’র (৩য় খণ্ড) ‘সূচনায়’ বলেছেন :

“আমি শীতগ্রীষ্ম মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি··· এইখানে নির্জন-সজনের নিত্য-সংগ্রাম চলেছিল আমার জীবনে।···মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ ও কর্মের পথ প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে।”

সাহিত্যের পথ ও কর্মের পথ জীবনে শুধু পাশাপাশি চলে নি, পরস্পরকে বারে বারে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে গিয়েছে। সাহিত্য পেয়েছে মানবতার গভীরতা ও মহিমা; কর্ম পেয়েছে আনন্দের সরসতা ও সুষমা। কর্মে ও রসসৃষ্টিতে মিলে কবিজীবন হয়েছে সৃজনের এক অখণ্ড সাধনা।

সৃজনের অখণ্ড সাধনা

কর্মের পথ কবিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে ভারতীয় কালচারের অনুরাগে শিক্ষার সূচনায়; আবার নিয়ে এসেছে “তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রের তীরে” স্বদেশী জাগরণে (১৯০৫-৭ ইং); ফিরিয়ে এনেছে ‘স্বদেশী সমাজ’-এর ভাবনায় (১৩১১ বাং); কোটি কোটি দেশবাসীর প্রতি অন্তরের বেদনায় প্রবুদ্ধ হয়েছে নূতন কর্মচেতনা—“মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থ ভাবে মানুষের সাধনা করিতে হইবে।” (স্বদেশী সমাজ)। দেশের নবোদ্বুদ্ধ যৌবনকে তিনি আহ্বান জানালেন :

"তোমরা যে পার ও যেখানে পার এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলি ব্যবস্থাবদ্ধ করো, শিক্ষা দাও, কৃষি শিল্প ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো, গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করো, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত করো।" (পাবনা সম্মিলনের অভিভাষণ ১৩১৪)।

কালীগ্রাম থেকে কবির এই "নিভৃত তপস্যা" আরম্ভ হয়ে ক্রমে এসে পৌছয় সুরুলের এই পল্লীপ্রান্তে। শান্তিনিকেতনে প্রধানত তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতি-সাধনা রূপ লাভ করেছিল। শ্রীনিকেতনে চল্লিশ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হয় তাঁর স্বদেশী সমাজের রূপায়ণ—"প্রাণ-উদ্‌যাপনের যজ্ঞ"। "সমস্ত দেশকে কি করে বাঁচাতে হবে এখানে ছোট আকারে তারই নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত।" শান্তিনিকেতনের পথ শ্রীনিকেতনে না পৌছলে রবীন্দ্রনাথের কর্মযোগের সাধনা খণ্ডিত হয়ে থাকত, সৃজনের অখণ্ড সাধনাও কবিজীবনে থাকত অসম্পূর্ণ।

কর্মযোগের সংকল্প

চব্বিশ বৎসর পূর্বে সৃজনের এই অখণ্ড রূপকে প্রত্যক্ষ করতেই এমনি উৎসবের দিনে শ্রীনিকেতনে এসেছিল একটি অখ্যাত অতিথি। তার মনে জাগ্রত কবির ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার এই আহ্বান, "তোমরা যে পার ও যেখানে পার এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও।" পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি উন্নয়ন, শিক্ষা সংস্কার, সমবায় পদ্ধতিতে ধনোৎপাদন ও ধনভোগ—এই তো সৃষ্টির কাজ, আর এই পথ দিয়েই দেশের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা সম্ভব, দেশের আত্মার অভিব্যক্তি সুনিশ্চিত। একটা দেশে তা সম্ভবও হয়েছে। কবির 'রাশিয়ার চিঠি'তে জেনেছি "আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্ট ভাবে তাই করছে।" (রাশিয়ার চিঠি)। এবং "রাষ্ট্রের প্রশস্ত ভুমি না পেলে জনসমূহ পৌরুষবর্জিত হয়ে থাকে ;" (মানুষের ধর্ম)। মানুষের ধর্ম তাতে খর্বিত হয়, আর দেশের অন্তরাত্মাও থাকে কুণ্ঠিত। সমস্ত দেশ জুড়ে কেন, একটি কেন্দ্রেও তখন আর মনুষ্যত্বেরও পরিচয় অব্যাহত হয় না। বিশেষত চতুর্থ-দশকের সেই সীমানায়

"ইতিহাসের ধিক্কার বহুকালের সুপ্তি মগ্ন এশিয়া মহাদেশের বক্ষেও দিয়েছে আঘাত" ; "তামসিকতার বন্দীশালায় শৃঙ্খলে দিয়েছে ঝংকার।" এমন কি তার অনুরণন স্তব্ধ হয় নি বাংলা দেশের বন্দীশালার অভ্যন্তরে। সেদিনের সেই অতিথিরও কানে সাত বৎসর ধরে বন্দীশালায় সেই ঝংকার বেজেছে। সেও এসেছিল কবির সৃজন যজ্ঞের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে, দুই চক্ষে নিয়ে এই অস্পষ্ট অনুভূতি—পৌরুষের প্রতিষ্ঠা চাই জন সমূহের জীবনে, দেশ জুড়ে চাই "প্রাণ-উদ্‌যাপনের যজ্ঞ"—জনশক্তির উদ্বোধন।

কবি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি করবে?" অনুভূতি ছিল অস্পষ্ট, উত্তর দেবার মতো সাহসও ছিল না। দুঃসাহসের পথে চলতে সাহসের অভাব হয় না। কিন্তু সৃজনের পথ কেবল দুঃসাহসের পথ নয়—সৃজনের পথ শান্ত সুদীর্ঘ নিভৃত তপস্যার পথও। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও বাংলা দেশের দুঃসাহসী চিত্ত সে পথের ইঙ্গিত পেয়েছিল কবির নিকটেই :

"শিক্ষিত সমাজ গণসমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই সর্বত্র প্রসারিত হইতে পারিবে।" (অভিভাষণ)।

আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ না হলে গণ-সমাজেরও সেই পৌরুষ-অর্জনের পথ নেই। কবির নিকট সেদিন বলবার সাহস হয়নি, চাই দেশ জুড়ে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার সুযোগ। তাই যে পারি যেখানে পারি এক-একটা গ্রাম অঞ্চলের বা শ্রমিক এলেকার ভার নিয়েই আমরা বসে যাব। কারণ সহায়-সম্বলহীনদের পক্ষে তা হতো হাস্যকর স্পর্ধা। সসঙ্কোচে বলতে হলো,—"জনসমাজের সঙ্গে এক হয়েই কিছু করতে হবে, এইটাই আমরা অনুভব করেছি।" স্নেহ আশীর্বাদ লাভ করেছিল সেই অখ্যাতের অনুভূতি।

চব্বিশ বৎসর পরে কবির সেদিনের শুভাশীর্বাদ স্মরণ করবার একমাত্র সার্থকতা এই যে, কেন এবং কি পরিমাণে সেই সৃজন-মহাযজ্ঞের প্রেরণা সার্থক বা খর্বিত, হয়তো শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের অনুবর্তীদের এবং লোকশিক্ষা ও লোকসংস্কৃতি আন্দোলনের কর্মীদের সেই অভিজ্ঞতা আজকের এই কর্মযোগের উদ্যোক্তাদের নিকট নিবেদন করা নিরর্থক নয়। রাষ্ট্রিক কর্মের উত্তেজনায় ও মত্ততায় নিশ্চয়ই কিছু না কিছু আত্মবিস্মৃতি আমাদের ঘটেছে ; লক্ষ্য অপেক্ষা উপলক্ষ সময়ে সময়ে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেশবাসীর প্রতি আত্মীয়তার অভাব ঘটেনি, এইটে স্বীকার্য। সফলতার

পরিমাণ বুঝে দেখতে চাই, কী পরিমাণে সত্যই এই কর্মযোগের সংকল্প কার্যকর হয়েছে। রাজনৈতিক মত্ততায় স্বদেশী সমাজের উপদেশ ও পাবনা সম্মেলনের আহ্বান কবির দেশবাসী গ্রহণ করে নি—এরূপ ধারণা অবশ্য সাধারণত প্রচলিত। কিন্তু জনসমাজের মধ্যে যদি কর্মপ্রচেষ্টা প্রসারিত না হয়ে থাকে তাহলে দেশ থেকে ইংরেজের শাসন শক্তি বিদায় নিল কেন? জগদ্ব্যাপী মানুষের শৃঙ্খল মোচনের তপস্যা তার একটা প্রধান কারণ, তা সত্য। কিন্তু ভারতবর্ষের তপস্যা মিথ্যা ছিল না, তা-ও সত্য। দেশের মানুষের মন থেকে বৃটিশ শাসনের সুবিস্তৃত মোহ ও সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা দূর হলো কোন মুক্তিমন্ত্রে? সেই অধোদয় যোগের দিনে কবি যার সূচনা দেখেছিলেন, তা দিনের পর দিন প্রসারিত হয়েছিল। দেশের দুর্ভাগ্যে—প্লাবনে দুর্ভিক্ষে; ও উৎসবে পার্বণে, তীর্থে মেলায়, সেবার মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে নিশ্চয়ই কিছু পরিমাণে আপনার করেছে কর্মীরা, রাজশক্তির অপরিমেয় ক্ষমতাকেও সে পরিমাণে করেছে দেশবাসীর চক্ষে নিষ্প্রয়োজন। সহস্র সহস্র গ্রামে কবি-নির্দেশিত 'স্বদেশী সংসদ' ও শত শত 'সম্মিলনী'—যে নামেই হোক—শহর ও গ্রামের জীবনযাত্রাকে সংযুক্ত করেছে, দেশবাসীকে পরস্পরের নিকটে এনেছে। অন্তত বাঙলাদেশে, আমরা জানি, গ্রামে ও শহরে কত সেবাসমিতি, কত ব্যায়ামাগার, কত পল্লীপাঠশালা, পাঠাগার ও নৈশবিদ্যালয় পরিচালনা করে নামহীন কত মানুষ দেশকে সুস্থ করতে, সচেতন করতে চেয়েছে। মেলাতে প্রদর্শনীতে, পূজায় উৎসবে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ম্যাজিক ল্যান্টার্নে প্রচার, স্বদেশী গান, কথা, আলোচনায়, বক্তৃতায়, চিত্রে, চার্টে, মূর্তি-রচনায় দেশবাসীর চিত্তকে তারা কত ভাবে স্পর্শ করতে এগিয়ে গিয়েছে। গ্রামের মধ্যে এখানে ওখানে নৈতিক ও সামাজিক আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মীরা আশ্রম স্থাপন করে গ্রামের ভার কিছু-না-কিছু গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি এই বহুমুখী প্রয়াসের সঙ্গে এরূপে চলেছে পল্লী সংগঠনের ব্রত। জেনে হোক না জেনে হোক, স্বদেশী সমাজের আদর্শ দেশের মানুষ এরূপে কিছুটা পালন করেছে বলেই দেশের মানুষও এই কর্মীদেরকে আপনার বলে গ্রহণ করেছে, তাদের পিছনে আপনারাও দাঁড়িয়েছে। আর, তার ফলেই বহুবিস্তৃত পরশাসন একদিন অবান্তর হয়ে পড়ল। দেশের কর্মীদের এই সাফল্যটুকু স্বীকার্য।

তারপরেই কিন্তু পরিষ্কার করে স্বীকার করতে হবে আমরা, স্বদেশী কর্মীরা, 'স্বদেশী সমাজ'-এর সৃজনমূলক দিকটিকে মূল কর্তব্যরূপে গ্রহণ করতে পারি নি। পারি নি জনগণকে আত্মশক্তিতে আস্থাশীল এবং সকল দিকে উদ্যোগী করে তুলতে। তারা পিছনে দাঁড়াতে শিখেছে। আপনার পায়ে দাঁড়াতে পারল না। পারলে, সেই স্বদেশী সমাজই যদি গড়ে উঠত—তা হলে ভারতবর্ষ বিভক্ত হতে পারত না, বাঙালী সমাজ দ্বিখণ্ডিত করা যেত না। আর, আজ যখন স্বাধীনতা আমরা লাভ করেছি, তখনও স্বাধীন ভারতের রূপ নিশ্চয়ই সকলের সামনে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। অন্তত দেশজোড়া এই নিরক্ষরতা যখন কিছুমাত্র লঘু হয় নি, তখনি শিক্ষার নামে এমন ইমারতী বিলাসে আমরা মাতছি কি করে? আজ যখন Community development রাষ্ট্রেরও সংকল্প, অর্থানুকূল্যও তাতে দুর্লভ নয়, তখন কেন গ্রামবাসী পারে না আপন সৃজন শক্তিকে উজ্জীবিত করতে, কেন আমলাতান্ত্রিক 'দপ্তর' ও 'দস্তর'-এর চক্র ছাড়িয়ে তা পৌঁছয় না গ্রামের প্রাণক্ষেত্রে? সামবায়িক কৃষি ও শিল্পগঠনের সংকল্প কেন শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে আছে? স্বাধীন সমাজ গঠনের কর্তব্যবোধ ও কর্তৃত্ববোধ কেন গ্রামবাসী ও শহরবাসী জনসাধারণের মধ্যে প্রকট হতে পারল না? কোথায় সেই "সাহসবিস্তৃত বক্ষপট"? কোথায় গেল এই স্বাধীনতার যুগে সেদিনের কর্মীরা যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের ভ্রূকুটি ও প্রলোভনে ছিল অটল? আজ কর্মে ও উদ্যোগে তাঁদের সেই আত্মনির্ভরতা কোথায়? রাষ্ট্র-স্বাধীনতা যদিবা আমাদের লাভ হয়ে থাকে, সামাজিক চেতনার বিস্তৃত ও সুদৃঢ় বিকাশে তা হয় নি। সর্বাঙ্গীণ আত্মশক্তির গঠনে তা আয়ত্ত হয় নি—সাধারণ মানুষ আপন হিতে, আপন স্বার্থে সচেতন ও উদ্যোগী হয়ে ওঠে নি। এই স্বদেশী সমাজের তাই তো প্রাণশক্তিও অপরিস্ফুট। অথচ একথা মিথ্যা নয়—আমরা দেশের কর্মীরা দেশবাসীকে সেবা করতে চেয়েছি। এমন কি, আত্মশক্তির সাধনাও আমরা আমাদের লক্ষ্য করেছিলাম—জনসাধারণকে পৌরুষে প্রতিষ্ঠিত করার আদর্শ মিথ্যা ছিল না। গ্রামেও আমরা পল্লীগঠনের ভার নিয়েছিলাম, শহরেও আমরা শুধুই উত্তেজনায় মেতে থাকি নি। শত সত্ত্বেও এখনো এই কর্মীরা কেউ কেউ গ্রামের কর্মেই আত্মনিয়োগ করে আছেন, এমন কি, একালের 'কল্যাণ-রাষ্ট্র'-র মুখাপেক্ষীও হতে চান না, একথা বলাই যথেষ্ট। অন্তরায় তবে কোথায়? স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের পক্ষে চাই আরও কী?

সৃজনের অন্তরায় : অন্তর্বৈষম্য

"যে-পার যেখানে পার"—এই ছিল কবির শর্ত। আজ অবশ্য বলা যায়, যিনি গ্রামের কাজের ভার নিয়ে বসেন সম্ভবত তাঁর পক্ষে জীবিকোপায় তত দুর্লভ নয়। নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সূত্রে গ্রামে এখন দাঁড়াবার মতো স্থান অনেক সময় পাওয়া যায়। একদিন কিন্তু অনিশ্চয়তার ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েই চাষ-বাস, শিক্ষকতা, চিকিৎসা প্রভৃতি একটা নামমাত্র কিছু সম্বল করেই এদেশের কর্মীকে গ্রামের ভার নিতে চেষ্টা করতে হতো। দুঃসাহসী ছাড়া কেউ তা পারে না। এই দুঃসাহসের প্রয়োজন এখনও শেষ হয়ে যায় নি।

জন-সমাজের মধ্যে আত্মশক্তির উদ্বোধন-চেষ্টা করতে গেলেই দেখা যায় কিছু-না-কিছু লোকের স্বার্থেও তাতে আঘাত পড়ে—সমাজ এমন ভাবেই গঠিত। একদলের অভ্যস্ত দুর্দশায় অপর দলের পুষ্টি। মহাজনই হোন, তথাকথিত কৃষিজীবী জমিদার বা জোতদারই হোন, বা হোন স্বাধীন বৃত্তি-জীবী উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক—সমাজের অন্তর্বৈষম্যের উপরই তাঁদের প্রতিষ্ঠা। এ সত্যটাও কবি পূর্বেই শুনিয়েছেন :

"সভ্যতা বিনাশের কারণ সন্ধান করলে একটি মাত্র কারণ পাওয়া যায়, সে হচ্ছে মানব সম্বন্ধের বিকৃতি ও ব্যাঘাত। যারা ক্ষমতাশালী ও যারা অক্ষম তাদের মধ্যেকার ব্যবধান প্রশস্ত হয়ে সেখানে সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছে। সেখানে প্রভুর দলে, দাসের দলে—ভোগীর দলে, অভুক্তের দলে—সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করে সমাজ দেহে প্রাণপ্রবাহের সঞ্চরণকে অবরুদ্ধ করেছে, তাতে এক বঙ্গের অতিতুষ্টি এবং অন্য বঙ্গের অতি শীর্ণতায় রোগ সৃষ্টি হয়েছে।" (পল্লী সেবা ১৩৩৮ বাং)।

আমাদের সমাজে এই রোগটি আরও জটিল। কারণ, এই বৈষম্য আমাদের সনাতন সামাজিক বিন্যাসের অঙ্গ এবং সকল ধর্মভাবনার সঙ্গে জড়িত। ভারতবর্ষের শ্রমভেদের প্রয়োজন আমরা মিটিয়েছিলাম বর্ণভেদ ও জাতিভেদ পাকা করে। জন্মসূত্রে কাউকে প্রভুর জাতিতে তুলে দিয়েছি কাউকে দাসের জাতিতে বেঁধে রেখেছি। এবং সেই সমাজ-বিন্যাস সম্বন্ধে আরও নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি তারই পরিপোষক মানসিক চেতনা ধারণাকে 'ধর্ম' করে তুলে। কারণ, জন্ম থেকেই এদেশের সমাজে যে কেউ দাস কেউ প্রভু, কেউ শূদ্র কেউ ব্রাহ্মণ, তার কারণ—আমাদের প্রত্যেকের জন্ম জন্মান্তরের 'কর্মফল'। মানুষ যে মানুষ হিসাবেই সমান মর্যাদার অধিকারী, একথা আমাদের সমাজে মোটেই

গ্রাহ্য হতে পারে না। 'অধিকারী ভেদ'ই সনাতন, 'মানুষের অধিকার' নয়। কাজেই এ সমাজে ভদ্রলোক ভদ্রলোক, ছোটলোক ছোটলোক। এরূপ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অন্য সমাজে যদি বা সম্ভব, আমাদের সমাজে তা আরও দুরূহ। কারণ, তা অধর্ম ; তাতে এ জন্ম তো গিয়েছেই, ভাবী জন্মও যাবে।

এরূপ সমাজে শিক্ষা দীক্ষার প্রথম ও মূল কথাটাই তো মানুষকে মানুষ বলে আত্মমর্যাদা দান, মানুষ হিসাবেই আত্মবিশ্বাসে ও আত্মশক্তিতে আস্থা দান—Rights of Man-এর প্রথম চেতনা-সঞ্চার। নিশ্চয়ই তার অর্থ সনাতন সমাজের বিপর্যয়। প্রচলিত শাস্ত্রের বাধা ও প্রচলিত স্বার্থের বাধা একই সূত্রে বাঁধা। দুয়েরই উদ্দেশ্য সমাজের 'স্টেটাস্ কুয়ো' বজায় রাখা, হয়তো বা 'স্টেটাস কুয়ো অ্যান্টিপলাশী'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 'মানুষের সাধনা' করলে সমাজ-কর্মীকে ক্ষমতাশালীদের নিকট বাধা পেতে হবে। সমাজের এই অন্তর্বৈষম্য আরও শোচনীয় এই কারণে যে, অনেক দিনের আর্থিক সামাজিক ব্যবস্থায় যাঁরা ক্ষমতাবান তাঁরাই শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ পান ; এমন কি শিষ্টাচার, রুচিনীতির আদর্শে তাঁরাই গ্রামের শীর্ষ স্থানীয়। হয়তো গ্রাম-সংগঠনেরও তাঁরা পক্ষপাতী ; কিন্তু দুই পা অগ্রসর হতে না হতে দেখা যায় তাঁরা প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ালেন। শিক্ষা দীক্ষার যে নিয়মে মানুষের আত্মসম্মানবোধ জাগা অনিবার্য, যে মানবতার আদর্শ দুর্দশা ও অপমানকে বিধিনিয়ম বলে না মেনে পৌরুষের বলে অতিক্রম্য বলে শিক্ষা দেয়—তাকে বাধা দান করাই হয়ে ওঠে সুবিধা ভোগীদের (Privileged section) নিয়ম। 'মানুষের সাধনা' এই পরিবেশে হয়ে ওঠে এই আভ্যন্তরীণ বিরোধের সাধনা—বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়।

গ্রাম্যতার বিভ্রান্তি

নিশ্চয়ই এ সাধনার পাথেয় বহুজনের আত্মীয়তাবোধ ; তার সিদ্ধির পথ—জনশিক্ষা। রায়তের অধিকারের কথা বিচার করেও রবীন্দ্রনাথ একদিন মনে করতেন শিক্ষা বিনা জমির অধিকার পেলেও কৃষক সে অধিকার রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু এ-শিক্ষা শুধু পুঁথি পড়ার ক্ষমতা নয় ; এ হচ্ছে 'অধিকার'-বোধের শিক্ষায় অধিকার-অর্জনের শিক্ষা, অধিকার-রক্ষার শিক্ষা। তাঁর বহুমুখী উপায়ের হিসাব নিতে গিয়ে দেখি—বাইরের জগৎ আমাদের

শহরের জীবনের উপর এসে পড়াতে যেমন আমরা একদিন জেনেছি—এ জীবন মিথ্যা নয়, তেমনি গ্রামের নিকটে এই বৃহৎ জগৎকে পৌঁছে দিলে গ্রামের এই বোধ জাগা অনিবার্য—মানুষ কোন অমৃতের অধিকারী। বাইরের বৃহৎ জগৎ আসে বই পত্র, সংবাদপত্র মারফৎ; আসে অত্যন্ত বাস্তব আধুনিক যানবাহন যোগাযোগে। কিন্তু একেই আমাদের গ্রাম অন্ধকারে পরিবৃত, তার ওপর বাইরের পৃথিবীর এ-স্পর্শ সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত নয়। অজ্ঞতার অবরোধ সৃষ্টি করাই হয়ে ওঠে আমাদের অনেক অকপট গ্রামকর্মীর ও গ্রাম-সংগঠনের সাধনা। গ্রামকে সংগঠন করার অর্থ তাঁরা মনে করেন বাইরের পৃথিবীকে ঠেকিয়ে রাখা। গ্রাম তাঁদের লাভ করে না, গ্রাম্যতা তাঁদের কবলিত করে—ভারতীয় নামে, সমাজ-জীবনের নামেও তাঁদের পেয়ে বসে গ্রাম্যতার বিভ্রান্তি। এই কঠিন সত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথই আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন:

"আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক তখন কখনো ইচ্ছা করি না যে গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেই রকমের সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম যা গ্রাম সীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত—বর্তমান যুগের যা প্রকৃতি তার সঙ্গে কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ।...গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে প্রাণ তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবিক প্রকৃতির কোনো দিক খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।...আমাদের দেশের গ্রামগুলিও শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্বৃত্তভোজী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক, এই কামনা করি।" (রাশিয়ার চিঠির উপসংহার)।

সভ্যতার সামঞ্জস্য

কথাটা বোঝা দরকার—রবীন্দ্রনাথ অতিকায় শহর ও অতিকায় কলকারখানার বিরোধী ছিলেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস সেরূপ শহর ও কারখানা বিশ্বপ্রকৃতিকে বিনাশ করে, মানব প্রকৃতিকে বিকৃত করে। শহর মাত্রই তাঁর নিকট পরিত্যাজ্য ছিল না, যন্ত্রপাতির প্রয়োগে শিল্পোৎপাদন তাঁর নিকট অগ্রাহ্য ছিল না। এইখানে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সুবিদিত। বরং এই কথাটাই ছিল তাঁর ধারণা "কলি যুগ কলের যুগ"। যুগের এই প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে জীবনযাপন অসম্ভব। যে যুগ যানবাহনে, কর্মের শত বন্ধনে দূর দূরান্তের মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় অনিবার্য করেছে, পরস্পরের

ভৌতিক ও মানসিক যোগাযোগ করে তুলেছে স্বাভাবিক, সে যুগে বিচ্ছিন্ন পল্লীসমাজ আর বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। থাকলে মানুষেরই আত্মপরিচয় তাতে খর্বিত হয়, মানুষেরই আত্মপ্রকাশ তাতে অবরুদ্ধ হয়—মানুষ থাকে আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত।

অথচ একথা সত্য—প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত-সভ্যতার আর্থিকভিত্তি বা 'ইউনিট' ছিল এরূপ বিচ্ছিন্ন, অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজ (village community)। হয়তো এরূপ গঠনের জোরেই সে সভ্যতা রাজা-রাজ্যের পতনেও ধ্বংস হতো না—সহস্র সহস্র বিচ্ছিন্ন পল্লীতে সচলই থেকে গিয়েছিল। শক হূন কেন, পাঠান-মোগল যে-ই আসুক; পল্লীসমাজ রক্ষা করেছে তার শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি-সভ্যতা, সৃষ্টি করেছে শিল্প-সাহিত্য। ভারত জীবনের এই সত্য কবি রবীন্দ্রনাথের ধ্যাননেত্রেও জাগরূক ছিল। আর তাঁর মতো রঙে রেখায় কল্পনোজ্জ্বল করে এ চিত্রকে আর কেউ আমাদের নিকট সত্য করে তুলতেও পারে নি। এক অর্থে স্বদেশী সমাজও তো সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজের আদর্শেই পরিকল্পিত। কিন্তু অন্যদিকে তখনও কবি সচেতন—অতীতের অনুবৃত্তি অসম্ভব—সেই বিচ্ছিন্ন পল্লীজীবনে প্রত্যাবর্তন অবাঞ্ছিত।

"বর্তমান কালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতে হইবে।" (স্বদেশী সমাজ)।

পরবর্তী কালে কবির এই বোধ আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ যুগের প্রকৃতিই হলো সহযোগিতা—মানুষে-মানুষে যোগাযোগের নিয়মে তা ক্রম-বিকশিত। সেই যুগ-প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করে আপন আপন গ্রামসীমায় গণ্ডিবদ্ধ থাকা অসম্ভব। সেরূপ বিচ্ছিন্নতায় 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা' লাভ হয় না—জন্মে কূপমণ্ডুকতা—ঘটে মনের অপমৃত্যু। সিভিলিজেশন ভারতের বাইরে বিশেষ করে 'সিভিস' বা পৌরজনের উদ্ভাবনা; কিন্তু জনপদের পক্ষেও সিভিলিজেশনের দান—বাস্তববিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৌতূহল, জিজ্ঞাসা ও চিত্তবৃত্তির অভাবনীয় ক্রমবিকাশ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সভ্যতার এরূপ অস্বীকৃতির চেষ্টারই নাম 'গ্রাম্যতা'। রবীন্দ্রনাথ যার কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাশিয়া দেখার অনেক আগেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এ বিষয়ে পরিচ্ছন্ন ছিল। শ্রীনিকেতন-পরিকল্পনায়ও তা দেখা যায়।

পল্লী-সংগঠনচিন্তায় কবির এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ গুরুতর বলে মনে করবার কারণ এই—ঠিক এই শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠার কালেই 'গ্রামে ফেরা'র ('Back to Village') নামে 'অতীতে ফেরা'র ('Back to Vedas') ঝোঁক আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তাকেও পেয়ে বসেছিল। সত্যের আহ্বান, যুগ-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যের ভাবনা তখন প্রায় অবহেলিত হতে চলেছিল গ্রাম-সংগঠন ও স্বদেশী সমাজ রচনার নামে। অথচ এক নিমেষের জন্যও কবির দৃষ্টিভঙ্গি এ বিভ্রান্তিতে ম্লান হয় নি। তাঁর কর্মাদর্শ ছিল সামঞ্জস্যের আদর্শ—শুধু অতীতে, তপোবনে বা আশ্রমে ফেরা নয়,—গ্রহণ করা তপোবনের 'বোধির তপস্যা', আশ্রমের 'মানবীয় আত্মীয়তা বোধ'। ভারতীয়তার নামেও পল্লীজীবনের বিচ্ছিন্নতা ও সীমাবদ্ধতা নয়; তার অনাড়ম্বর আত্মনির্ভরতার সঙ্গে আধুনিক যুগের সহযোগিতা-ধর্মের সামঞ্জস্য।

এই মূল কবিদৃষ্টিতে প্রবুদ্ধ ও পরিচালিত হলেই আজ পল্লী-সংগঠন সম্ভব। এবং শুধু শিক্ষায় দীক্ষায় নয়, পল্লীজীবনের যাতে স্বচ্ছন্দ প্রকাশ, সেই পল্লী সংস্কৃতি ও পল্লীর আনন্দানুষ্ঠানের উজ্জীবনও এই কবিদৃষ্টি ও তাঁর সামঞ্জস্য-বুদ্ধিকে বর্জন করে সম্ভব নয়। সামঞ্জস্যের নীতিই পল্লী-সংগঠনের মূল নীতি। পল্লীর সংস্কৃতি-সৃষ্টির ব্যাপারেও তা অনুভব করতে হয়।

আনন্দ সৃষ্টির পথ

প্রাণলীলা শুধু প্রাণযাত্রাতেই নিঃশেষ হয় না, চায় প্রকাশ। সে প্রকাশ উৎসবে আনন্দে, রসের উপভোগে ও রসের সৃষ্টিতে, প্রাণের সহিত প্রাণের আদানে প্রদানে। পল্লী-জীবনের নিরানন্দতা আজ কঠিন সত্য। প্রাণের উপবাস যেন দেশজোড়া। একদিন যে তা ছিল না এই গতানুগতিক পল্লীপার্বণ উৎসবের মধ্যে এখনো আমরা তার চিহ্ন পাই। বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত লেগেই ছিল আমাদের 'ঋতু উৎসব'—ঋতুরঙ্গভূমিতে সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারার সঙ্গে চিরদিনের আত্মীয়তা তাতে অনুভূত হতো। জন্ম, বিবাহ, মাতৃত্ব, অন্নারম্ভ, বিদ্যারম্ভ, হয়তো বা ভাইফোঁটা—এরূপ অজস্র সামাজিক উৎসব ছিল বৎসরে—সংসারের বিচিত্র সম্পর্কের রসাস্বাদন করতে করতে তাতে সরল জীবন হতো সরস। আর 'ধর্মোৎসব' তো, পূজা-ঈদ-মহরম

কেন, সকলের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। সেই সঙ্গে তেমনি অবিচ্ছিন্ন সেই জীবন, সেই উৎসবাদির সঙ্গে তখনকার পল্লীর শিল্পাবদান। কিন্তু সে সমাজ আজ যেমন মৃত, সঙ্গে সঙ্গে সেই শিল্পেরও এখন মরণদশা। হাতের কাজে, তাঁতের কাজে, মাটির কাজে—কিছুতেই তাই মন ওঠে না আর পল্লীর মানুষেরই। কারুশিল্পের মতোই পল্লীর স্বাভাবিক রসসৃষ্টির ধারাগুলিও এরূপ শুষ্কপ্রায়। যাত্রা, কবিগান, কথকতা, পাঁচালী, কীর্তন, রামায়ণ গান, ঝুমুর, কিম্বা জারি, সারি, গাজন এমন কি আউল-বাউল-দরবেশী গান—অথবা গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া—কিম্বা সেই লাঠিখেলা, বাইচখেলা প্রভৃতি নানা গ্রাম-শিল্প ও আনন্দের আয়োজন আজ আর গ্রামের জীবনে তেমন জীবন্ত নয়। তাই গ্রামের আনন্দের পিপাসাও তাতে মেটে না। এসব পল্লী-আয়োজন অপেক্ষা বরং আধুনিক কালের আনন্দ-আয়োজনে পল্লীবাসীরও আকর্ষণ বেশি। আধুনিক জীবনযাত্রার যেটুকু হাওয়া পল্লী-জীবনে লেগেছে তাতেও আধুনিকতাতে পল্লীবাসীর রুচি গড়ে উঠছে। বাইরের জগৎ নিয়ে এসেছে প্রাণের উদ্দাম প্রবাহ। নতুন কালের খেলাধূলায় তাই আজ গ্রামবাসীরও ঝোঁক। নাটক ও নৃত্যের নামে সে পাগল। গানের নামে সে কাজকর্ম ভুলে যায়। এমন কি সর্বাপেক্ষা সুলভ যে আনন্দের উৎস, যা সর্বাপেক্ষা নিন্দিত, যাকে যুগশিল্প না বলার কোনো যুক্তি নেই—সেই সিনেমাতেই কি গ্রামের মানুষের পিপাসা কিছুমাত্র কম? ভগ্নোন্মুখ নিরানন্দ গ্রাম্যজীবনের দিকে তাকিয়ে কে বলবে ফিল্ম বা রেডিও সেখানে অবাঞ্ছিত? কিন্তু কে না মানবে—সিনেমা রেডিওতে যুগের বিকৃতি যত বিস্তৃত হচ্ছে, যুগের শ্রী-সম্পদ ও শালীনতা তত আশ্রয় পাচ্ছে না। তাই তাতে গ্রামবাসীর মধ্যে রুচির উৎকর্ষ অপেক্ষা রুচির বিকৃতিও ব্যাপক হবারই কথা।

এইখানেই আবার ওঠে সেই সামঞ্জস্যের কথা। সামঞ্জস্যের আদর্শ মনে রাখলে বুঝি—রুচিবিকৃতি বেশি মারাত্মক, না, নিরানন্দতা বেশি মারাত্মক, এ প্রশ্নটাই ভ্রান্তিপ্রসূত। কারণ, নিরানন্দতার থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় তো রুচিবিকার নয়। একটা সামঞ্জস্যের পথ রবীন্দ্রনাথই আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক রুচিকে আনন্দের ও শালীনতার সঙ্গে তিনি সমান্বিত করেছেন—নৃত্যে, নাট্যে, গানে, সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে, জীবনযাত্রার শত আয়োজনের ক্ষেত্রে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লোক-

সংস্কৃতির ঐতিহ্যকেও তিনি রূপান্তরিত করেছেন। আর, সবশুদ্ধ প্রাণকে দিয়েছেন স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। একবার কি আমরা বুঝে দেখি সেই দানের স্বরূপ? রবীন্দ্রসৃষ্টির ধারায় আমাদের একালের উৎসবে সভাসমিতিতে এসেছে গানের স্পর্শ, সভামণ্ডপে আলপনার শ্রী। নৃত্য এসেছে নবজাতক রূপে—ছন্দভোলা সমাজজীবনে। নাটক এসেছে সঙ্গীতের বাহন হয়ে—রঙ্গমঞ্চে তার অসঙ্কোচ আসন। ছড়া, গান, রূপকথা, ব্রতকথা—সবই তার দৃষ্টিতে আদরণীয়। কিন্তু কই, পুরনো কবিগান, কথকতা, পাঁচালী, এমন কি পল্লীগীতির ঐতিহ্যকে তো তিনি আঁকড়ে থাকেন নি, আধুনিকতার উৎকট মত্ততায়ও তিনি আপনাকে ভাসিয়ে দেন দিন।

একথা ঠিক, এ সামঞ্জস্য সম্ভব হয়েছে কবির সৃজনশক্তির ইন্দ্রজালে—অসামান্য প্রতিভার অসামান্য সাধনায়। ঋতুতে ঋতুতে সঙ্গীতে নাটকে, শেষে নৃত্যনাট্যে কবি যে আনন্দ-অনুষ্ঠানের উদ্ভাবনা করেছিলেন এমন প্রতিভা আর কোথায় যে তেমন শিল্পসামঞ্জস্য সাধিত করবেন? এমন সূর্য কোথায় যাঁর আকর্ষণে গায়ক, গীতকার, অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী, চিত্রকর প্রভৃতির সমাবেশ সম্ভব হবে? এমন বৈষয়িক শক্তিই বা কার কাছে যার ব্যবস্থাপনায় এরূপ আয়োজন অন্যত্র হতে পারে? এসব নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু কথাটা এই যে, পথ যিনি নির্দেশ করেছেন, তিনি 'ফরমূলা' তৈয়ারি করতে চান নি—নব নব সম্ভাবনা এই যুগে নিত্য উদ্ভাসিত হয়। সেই যুগপ্রকৃতির সঙ্গে চাই দেশের শিল্প উদ্ভাবনার নিত্য নব নব সামঞ্জস্য।

এই দুঃসাধ্য সাধনা গ্রামের যেখানে উদযাপন করা সম্ভব নয়, সেখানে কি অবসাদের অভিশাপই অচল হয়ে থাকবে? প্রতিভা সুদুর্লভ বলে কি প্রাণের প্রকাশও নিষ্প্রয়োজন? আনন্দ-অনুষ্ঠানে কি পল্লীর মানুষের প্রতিদিনকার পিপাসা পূর্ণ করতে নেই? তাদের-মনে যে সৃজনের অনুভূতি আছে তা কি থাকবে ছাই-চাপা? কথাটা এই, অন্তত পল্লীর শিল্পচেতনাকে পরিতৃপ্ত করা ও পল্লীর মানুষের স্বাভাবিক সৃষ্টিপ্রবণতাকে পরিপুষ্ট করাও প্রয়োজন।

স্বীকার করা উচিত—কলেগড়া আনন্দানুষ্ঠানের যারা স্রষ্টা তাদের সঙ্গে ভোক্তাদের আদান-প্রদানের অবকাশ নেই। সেখানে রসভোগের আনন্দ নিষ্ক্রিয় আনন্দ—রেডিওতে নাট্যাভিনয়ের মতো। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয়ে শিল্পীর সঙ্গে দর্শকের ও শ্রোতার জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তা

গড়ে উঠলেই শিল্পকলা পূর্ণশ্রী লাভ করে। সেখানে ভোক্তাদের আনন্দ হচ্ছে সক্রিয় রসভোগের আনন্দ। এরূপ সম্পর্কের মধ্যেই পল্লীর শিল্পকলা ও আনন্দ-অনুষ্ঠানের অনেকটা উপযোগিতা। পল্লীর সংস্কৃতি সক্রিয় আনন্দের যোগাযোগকে যত সত্য করে তোলে তা অন্য কিছুতে হয় না। যাত্রা, কবিগান, কথকতা, পাঁচালী প্রভৃতি পল্লীগ্রামে কি আর মানুষের সত্যিকারের দাবি মেটাতে পারে না? 'ব্যালে' যাদের প্রায় জাতীয় সম্পদ, তারাও তো পুতুলনাচের নব নব ধারা উদ্ভাবিত করছে। আমাদের পুতুলনাচই কি কেবল লুপ্ত হবে? এদেশের নরনারীর সহজাত সৃষ্টিক্ষমতা কি গীতে-গানে-বাঁশিতে-বাজনায়, আলপনায়, সূচীকর্মে, মূর্তিশিল্পে—পূজায় পার্বণে, শত উৎসবে, শত উপলক্ষে মানুষের সেই আনন্দ অনুভূতিকে সজীব করতে পারে না? বাউল, ভাটিয়ালী, পল্লীগীতি—সেই পল্লীর জীবন্ত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও—শহরের আবর্জনায় 'আর্ট' বলে গ্রাহ্য হচ্ছে। গণ-নাট্য আন্দোলনের কর্মীরা দেখেন—বাঙালীর মর্মকোষে এখনো তার অনুভূতি সঞ্চিত আছে। তাহলে বাঁকুড়ার ঘোড়া, পটুয়াদের শিল্প, গ্রাম্য-মেয়ের নক্সাকরা কাঁথা, লক্ষ্মীর সরা ঐ 'আর্টবাবুদের' মুখ চেয়েই কেবল গড়তে হবে কেন?

একটা কারণ বোঝা যায়—যেখানে তার জন্ম ও জীবন স্বাভাবিক, সেই গ্রামের মাটি থেকে তার শিকড় ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। জীবনের সঙ্গে তা আর জড়িয়ে নেই। তবু তো গ্রাম থাকবেই, কৃষিপ্রধান দেশে তারই সংখ্যা হবে প্রধান। তাহলে সেই গ্রামজীবনের মধ্যে বাড়ির আঙিনায় দুটি সযত্ন ফুলগাছে—একটি গাঁদার সারে, বেল-যূথী-শেফালি দিয়ে—জীবনযাত্রায় সৌন্দর্যচর্চার একটু অবকাশ রচনা করতে বাধা কি? এসব কোনো প্রকাশই তো তুচ্ছ নয়, শুধু অতি সহজায়ত্ত বলেই তার মূল্য আমরা দিই না। আর অতি মুমূর্ষু বলেই আমরা উদ্যম হারিয়েছি—অন্যদিকে উৎসবকে করে তুলেছি বিত্তের বাহুল্যে উৎকট। এমন কথা কেউ বলবে না যে, আমাদের পল্লীজীবন নূতন যুগের আঘাতেও পরিবর্তিত হবে না, গ্রাম্যসংস্কারও থাকবে অপরিবর্তিত, আনন্দ-অনুষ্ঠানেরও পুনরাবৃত্তিই যথেষ্ট। জীবনযাত্রার রূপান্তর অনিবার্য, আর জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজসংস্কৃতি সবই রূপান্তরিত হবে—যা বর্জিত হবার মতো তাকে শত দুশ্চেষ্টায়ও টিঁকিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু কথা এই—যা টিঁকে থাকবার মতো তাকে চেষ্টার

অভাবে, অবহেলায়, এখন থেকে বর্জন করা অত্যাচার ছাড়া কিছু নয়। একদিন মরতে হবে বলে আজকেই মৃত্যুকে আশ্রয় করলে তা হয় আত্মহত্যা।

নিঃসন্দেহ আজ জীবনযাত্রা দ্রুত ধারায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এ যুগের কারুবিদ্যা পৃথিবীতে যে বিপ্লব ঘটাচ্ছে তা চোখের সামনে ঘটছে বলেই তার স্বরূপ আমরা বুঝে দেখছি না। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি— আজ পল্লীজীবনে আনন্দরচনা মোটেই দুঃসাধ্য কাজ নয়। পুরাতন পল্লীর পরিবেশে যে উৎসব ও লোকশিল্পের প্রকাশ ঘটে, তারই পার্শে নতুন উদ্যোগের নব রচনাও সুসম্ভব। রেডিও আজ দূর দূরান্তরের পল্লীরও বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দেয়। কেন তেমন সুদূর পল্লীর কোনো একটি সাধারণ ব্যবহৃত গৃহে বেতার-ব্যবস্থা সুসম্ভব হবে না? স্কুল, ডাকঘর, পাঠাগার কিংবা নাটমন্দির—যা-ই থাক যে গ্রামে—সেখানেই তো বিশ্বদূতের এই সভা বসতে পারে। পূর্বেকার যাত্রা ও কবি-গানের মতো একালের 'মুক্ত-অঙ্গন' নাট্যদল নিজেদের আসর বেঁধে নাটক দেখাচ্ছেন গ্রামে—দূরবাহী শব্দযন্ত্রকে মাইক) বাহন করে তাদের কথা ও গান পৌছনো যায় সহস্র সহস্র নরনারীর কানে ও মনে। ঘূর্ণ্যমান সরকারী বা বেসরকারী প্রোজেকটার যন্ত্রের সাহায্যে চিত্তাকর্ষক প্রামাণিক চিত্র ও শিল্পোত্তীর্ণ চলচ্চিত্র পরিবেশনও এক-একটি গ্রামে সপ্তাহে এক-আধদিন অসম্ভব নয়। পল্লীতে স্কুল, গ্রন্থাগার, ডাকঘর, তারঘর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বিজলীশক্তি প্রতিষ্ঠার মতোই রেডিও ও চলচ্চিত্রের প্রবর্তন অদূরেই অবশ্যম্ভাবী। ততক্ষণ পরিচিত প্রণালীতে গান, বাজনা, অভিনয় প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠান ও সৃজনকর্ম যেমন চলছে চলুক। সেই সঙ্গে আধুনিক কারুবিজ্ঞানপুষ্ট আনন্দ-অনুষ্ঠানে পল্লীর বিচ্ছিন্নতা ও নিরানন্দতা ভাঙাও আরম্ভ হোক। কবি দেখেছিলেন মস্কোর থিয়েটারে সিনেমায় গ্রাম্য রুশ কৃষকের রসবোধ বর্ধিত হয়েছে। তা হলে আমাদের পল্লীশিল্পী কি উন্নততর শিল্পপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আপন শিল্পকে সচল প্রাণবান করতে পারেন না? চলচ্চিত্র ও বেতার প্রভৃতির অপপ্রয়োগ সত্ত্বেও নির্ভয়ে স্বীকার করি—জনসাধারণের তা মহৎ ভরসা। তা যুগের শিল্পপদ্ধতি।

প্রধান যে দু-একটি কারণে পল্লীজীবনে শূন্যতা দেখা দিয়েছে আমি তা নিবেদন করলাম—কবিদৃষ্টির সহায়ে তার যে সমাধান সম্ভাব্য মনে হয় তা-ও

আমাদের বিচার ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী জ্ঞাপন করলাম। জ্ঞানের অবকাশের অভাবে এবং রসভোগের ও রসসৃষ্টির অভাবে যে অবসাদ পল্লীজীবনে ব্যাপক হয়ে আছে তাতে পল্লীজীবনের বিকৃতি ঘটা অনিবার্য। কল-কারখানা ও শহরের কৃত্রিম উত্তেজনাই মনুষ্যত্বের বিকৃতি ঘটায় না। পল্লীর নিরবচ্ছিন্ন নিরানন্দতাও মানুষের বিকৃতি ঘটায়, একথা আমরা কে অস্বীকার করতে পারি?

শহরধর্মী গ্রাম ও গ্রামধর্মী শহর

আশ্চর্য নয় যে, মানুষ শহরমুখো হয়ে ওঠে, শুধু বিকৃতির বশে নয়, প্রাণের তাগিদেও। অন্য দেশে হয়তো তা ঘটে শহরের কৃত্রিম বিভ্রমের (glamour) জন্য। আমাদের দেশে তার মূল কারণ আর্থিক—শহরে জীবিকালাভের আশা। পল্লীজীবনের আর্থিক পুনর্গঠনও তাই পল্লীসংগঠনের মূল কথা। উন্নত কৃষিপ্রণালী, উন্নত পল্লীশিল্প, মিত শ্রমিক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রের ব্যবহার, পল্লীশিল্পে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রয়োগ, বিজলীশক্তি প্রসার, সমাজের নূতন বিন্যাস, সামবায়িক ধনোৎপাদন ও ধনভোগ—যে সব আর্থিক উপযোগের কথা রবীন্দ্রনাথ পল্লী-গঠনে উল্লেখ করেছেন—লেনিনের ভাষা বদলিয়ে কবির 'স্বদেশী সমাজ'-এর এই উপাদানকে বলা যায় "এডুকেশন এ্যাণ্ড কো-অপারেটিবস।" যাঁরা এই প্রাণ-যজ্ঞের আলোচনার অধিকারী তাঁরা পূর্বেই আলোচনা করেছেন। এসব যে আমাদের স্বাধীন ভারতের 'স্বদেশী সমাজ'-এর প্রয়োজনীয় বনিয়াদ, এ কথা ধরে নিয়েই আমি কিছু কিছু সংস্কৃতিকর্মীরও অভিজ্ঞতার শিক্ষা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করলাম—কবিরই কথা "পল্লীর প্রাণকে প্রকাশিত করো—পল্লীসমাজ বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে বৃহত্তর পৃথিবীর জীবনযাত্রার সহযোগী হোক, কবিজীবনের সাহিত্যের পথ ও কর্মের পথের মতো পল্লীজীবনের সংস্কৃতি রচনার পথও জীবনরচনার পথও একসঙ্গে চলুক—জ্ঞানে কর্মে আনন্দে যেন পল্লীবাসী সকল রকমেই শহরবাসীর সহযোগী হয়ে উঠতে পারে"—'স্বদেশী সমাজ'-এর এরূপ বিকাশই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল।

এই কথাটাও বোঝা উচিত—গ্রামের সঙ্গে শহরের যে বৈপরীত্য এতদিন সভ্যতার পক্ষে অনিবার্য ছিল, আজ সভ্যতাই তা ঘুচিয়ে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তার সূচনা দেখে এসেছিলেন তখনকার রাশিয়ায়। বিজ্ঞানের নব নব দানে

এদেশেও তার শুভসূচনা তো একেবারে অসম্ভব নয়। শহর এখন হতে পারে 'টাউনশিপ' উপনগর বা 'গার্ডেন সিটি' 'উদ্যান নগর', গ্রাম হতে পারে পৌরপ্রসাধনে সুন্দর গ্রাম—এক-একটি শ্রীনিকেতন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক উপযোগের সঙ্গে আনন্দের ও উৎসবের উপযোগগুলির মিলন হলে পল্লীলক্ষ্মী আর পুরলক্ষ্মীর তুলনায় শ্রীহীনা থাকবার কথা নয়। এই শ্রীনিকেতনে স্বদেশী সমাজের সেই সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। চাই শুধু "সাহসবিস্তৃত বক্ষপট" যাতে সমস্ত দেশের জন্যও বলতে আর মানতে পারি—"নাল্পে সুখমস্তি"। শ্রীনিকেতনে উচ্চারিত কবির সেই কামনাই জাতির প্রতিজ্ঞা হোক: "আমাদের গ্রামগুলি……মনুষ্যত্বের পূর্ণসম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক।"

শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসবের তৃতীয় অধিবেশনে 'রবীন্দ্রনাথ, পল্লীসংস্কৃতি ও আনন্দানুষ্ঠান' বিষয়ক আলোচনায় (৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬২) পঠিত—লেখক।

টয়েন্‌বির 'পুনর্বিচার'

সুশোভন সরকার

১৯১৪ সালে অক্সফোর্ডের এক তরুণ শিক্ষাব্রতীর মনে সহসা এই চিন্তার উদয় হয় যে গ্রীক ঐতিহাসিক থিউকিডিডিস-এর চোখে সে-যুগে তখনকার সভ্যতার যে-সঙ্কট ধরা পড়েছিল, আজকের দিনে আমাদের সভ্যতার ভাগ্যেও সেই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। আর্নল্ড টয়েন্‌বির তখন মনে হলো যে তাহলে মানুষের ইতিহাসে বিভিন্ন সভ্যতাগুলি তুলনীয়, মানব-অভিজ্ঞতায় তারা যেন 'সমসাময়িক', তাদের উদয়-বিস্তার-সঙ্কট-পতনের একটা মোটামুটি ছক কাটা বোধহয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অসম্ভব নয়। ১৯২১ সালের মধ্যে তুলনীয় সভ্যতাগুলির একটা ছবি টয়েন্‌বির কাছে স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস দাঁড়ায় যে ইতিহাসচর্চার সার্থকতম ক্ষেত্র হলো দেশ বা জাতি নয়, নানা দেশ সম্বলিত এক একটি সভ্যতার রূপরেখা নির্ধারণ। ১৯৩৪ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত তিন পর্যায়ে তাঁর দশখণ্ড 'ইতিহাসের আলোচনা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে; একাদশ খণ্ড 'মানচিত্রাবলী ও ঐতিহাসিক স্থাননির্দেশ' নামে প্রকাশ পায় ১৯৫৯-এ; আর গতবৎসর আলোচনা সম্পূর্ণ হলো 'পুনর্বিচার' নামক দ্বাদশ খণ্ডটিতে। এতদিনকার বিরাট পরিকল্পনার সফল পরিসমাপ্তি ইতিহাসরচনার ইতিহাসে প্রায় তুলনাহীন বলা চলে।

পেশাদারী ঐতিহাসিক মহলে আর্নল্ড টয়েন্‌বি বিশেষ সমাদর পান নি বললে অন্যায় হবে না। এমন ব্যাপকভাবে ইতিহাসকে দেখবার চেষ্টা ইতিহাস-লেখকদের কাছে অমার্জনীয় মনে হয়েছে; আজকাল পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাপারের গভীর অনুশীলনই প্রচলিত রেওয়াজ, সঙ্কীর্ণ বিষয়ে গবেষণা ছাড়া আর কোনও প্রয়াস আজ অগ্রাহ্য। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইতিহাস-পত্রিকাসমূহে তাই বহুদিন পর্যন্ত টয়েন্‌বির ভাগ্যে জুটেছিল হয় উপেক্ষা, নয়তো বা নিন্দা ও বিদ্রূপ। সম্প্রতি কিছুটা হাওয়া বদল অনুভব করা

যায়, যদিও সে-হাওয়া এদেশে পৌঁছতে নিশ্চয় যথারীতি দেরি হবে। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক পাওয়িক্‌-এর মতে—স্বচ্ছন্দ-মনে না হলেও সাধারণ সূত্রের সন্ধান ইতিহাস-লেখকদেরও কর্তব্য।

দুই

একবার যা লেখা হলো সেটাই চিরন্তন মনে করা লেখকমাত্রের স্বাভাবিক অভিমান বলা চলে। টয়েন্‌বির 'পুনর্বিচার' এর মহৎ ব্যতিক্রম। 'ইতিহাসের আলোচনা' গ্রন্থের প্রায় দুইশত সমালোচনাকে এখানে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, সমালোচকেরা অবশ্য নানা দেশাগত। পরীক্ষার ফলে টয়েন্‌বি তাঁর অতীতের মতামত কিছু পরিমাণে সংশোধন করেছেন, যেখানে পারেন নি সেখানে বিরোধী যুক্তিখণ্ডনের চেষ্টাও করা হয়েছে। এ ধরনের পুনর্বিচারের উদ্যমটাও ইতিহাস-সাহিত্যে দুর্লভ।

সরলভাবে টয়েন্‌বি বলছেন যে তাঁর লেখায় সত্য সত্যই অনেক গলদ আছে। অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক সাদৃশ্যকে তিনি অযথা বড় করে দেখেছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি কোনও কোনও অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের অভাব রয়েছে, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রিক জীবনের আওতার বাইরে মানুষের অনেক কিছু ব্যাপারের প্রতি তিনি খানিকটা নিরাসক্ত থেকেছেন, ইতিহাসে বলপ্রয়োগ অথবা পার্থিব জীবনযাত্রার প্রভাবের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্যও দৃষ্টিকটু। তাঁর উদ্ভাবিত বিপরীত অথচ পরিপূরক অনেক সংজ্ঞা (যেমন challenge and response-এর সুবিদিত সূত্রটি) অন্যায় প্রাধান্য পেয়েছে ; কিছু কিছু ছক (যেমন withdrawal and return) সত্যই ব্যাপক বলে মেনে নেওয়া শক্ত। প্রাক্‌-সভ্যতার সমাজগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দেওয়াটা নিতান্ত অন্যায় হয়েছে। ভারতীয়, চৈনিক, সিরীয় অথবা মধ্য-আমেরিকার সভ্যতাগুলির রূপরেখার ক্ষেত্রে অনেকখানি অদলবদল প্রয়োজন, পুরাতত্ত্বের নূতন আবিষ্কার, কিম্বা বিশ্লেষণী বিচারের ফলে সংশোধন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। হেলেনীয় সভ্যতা থেকে উত্থান-পতনের যে-সূত্র টয়েন্‌বি অন্য সভ্যতায় প্রয়োগের প্রয়াস পেয়েছিলেন, তার ফাঁকটাও এতদিনে তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত। গলদ শুধরে নিতে বিচলিত হলে চলে না, জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেটাই হলো স্বাভাবিক। পাহাড়ে চড়তে গেলে ধাপে ধাপে দিগন্তরেখা বিস্তৃততর হতে বাধ্য।

সংশোধনের প্রয়োজন মেনে নিলেও টয়েন্‌বির বৃহৎ পরিকল্পনা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যায় না। বিশেষজ্ঞের চোখে তাঁর 'আলোচনা'র মধ্যে ফ্যাক্টের ভুলচুক অনেক ধরা পড়েছে, কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির প্রকোপে ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বতমালার মতন তাঁর রচনা এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলা নিতান্ত অন্যায় নয়। সভ্যতার বিচার ইতিহাসের একটা প্রধান বিষয়বস্তু মেনে নেওয়া যেতে পারে। সভ্যতার বিশ্লেষণে একটা 'মডেল' বা মাপকাঠির ব্যবহার-ও কাজে লাগে। টয়েন্‌বি প্রথমত হেলেনিক ইতিহাসের ধারাকে অন্য সভ্যতা বোঝার ব্যাপারে চাবি হিসাবে প্রয়োগ করেছিলেন, এখন তার সঙ্গে যোগ করলেন চীনে ইতিহাস-চর্চার একটা সূত্র অর্থাৎ ইতিহাসে বিক্ষোভ ও শান্তি, দুর্দিন ও সুদিনের পর্যায়ক্রম, যে-সূত্র দেখা যায় ইব্‌নে খালদুনের চিন্তার মধ্যেও। টয়েন্‌বির তালিকায় বড় সভ্যতার সংখ্যা এখন তেইশ থেকে নেমে তেরোতে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় সিরীয় ও হেলেনিক সভ্যতার সংমিশ্রণে তিনি এক উর্বর ক্ষেত্রের কল্পনা করেছেন, প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষ যেখানে সারের মতন নূতন শস্য উৎপাদনের সহায় হয়েছে। অতীতের সকল সভ্যতার প্রধান গলদ যুদ্ধবৃত্তি এবং সামাজিক অত্যাচার, একথা টয়েন্‌বি স্বীকার করছেন। প্রতি সভ্যতার সার্বভৌম সাম্রাজ্যের মধ্যে একটা শোষণের প্রবৃত্তি, আর্থিক পীড়ন ও শাসনযন্ত্রের নিষ্পেষণের ফলে তার অবক্ষয় দেখতে তিনি প্রস্তুত।

টয়েন্‌বি-বাদ, তার বিশেষ সিদ্ধান্ত ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির অনেক কিছু আমার কাছে স্বীকার্য নয়। কিন্তু ইতিহাসের ব্যাপক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁর প্রচেষ্টা এবং তার সম্ভাব্যতার প্রতি মৌলিক বিশ্বাস অভিনন্দনযোগ্য বলে মনে করতে আমার দ্বিধা নেই। পণ্ডিতমহলে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা আমার মতে একটা প্রচলিত অন্ধসংস্কার মাত্র। ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর তিনটি প্রধান মাহাত্ম্য চোখে পড়ে—ব্যাপক মানবিক দৃষ্টির প্রসার, অতীতকে আয়ত্তে আনার চেষ্টায় 'প্যাটার্ন' বা ছকের সাহসী অনুসন্ধান করে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার যাথার্থ্য পরীক্ষা এবং প্রচুর তথ্যের সহযোগে ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল সৃষ্টি। গুণগুলি অসামান্য বল্লে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। ফলে 'ইতিহাস আলোচনা' গ্রন্থটির ইতিহাস-রচনার রাজ্যে দীপশিখার মতন উজ্জ্বল হয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

তিন

ব্যাপক মানবিক দৃষ্টির নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে এ-গ্রন্থের পাতায় পাতায়। পশ্চিম জগৎ, পাশ্চাত্ত্য দেশের গণ্ডি থেকে ইতিহাস এখানে মুক্তি পেয়েছে; প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে ইওরোপীয় প্রভুত্ব, ইওরোপের দম্ভ, পশ্চিমী অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ইওরোপীয় আত্মরতি, নর্ডিক প্রাধান্য, অথবা ইংরাজসুলভ আত্মসন্তুষ্টির ভাব এখানে অনুপস্থিত। মানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায়; খ্রীষ্টান ঐতিহ্য ও সংস্কার বর্জিত হয়েছে বলা চলে, অগ্রাহ্য হয়েছে ভগবানের বিশেষ দয়ার পাত্র বিশিষ্ট জাতি অথবা প্রেরিত মহাপুরুষের ধারণা। স্বীকার করা হয়েছে যে বিজ্ঞানের ঝোড়ো হাওয়ায় আজ উড়িয়ে নিয়ে গেছে প্রচলিত ধর্মের সংস্কারের বোঝা। মানবিকতার প্রভাব দেখা যাচ্ছে জাতিগত স্বার্থের বর্জনের প্রচেষ্টার মধ্যে, বিশ্ব-ঐক্যের আদর্শে, আজকের দিনের উপযোগী সহাবস্থানের নীতির ভিতর। হেলেনীয় মানবিকতার পূজারী টয়েন্‌বির চোখে ইতিহাসকে নিছক রাষ্ট্রিক ঘটনার মধ্যে আবদ্ধ রাখাটা স্বাভাবিক মনে হয় নি। মানবিক দৃষ্টির প্রভাবেই তাঁর কাছে ধরা পড়েছে আধুনিক ঐতিহাসিকদের দুর্বলতা, বিশেষজ্ঞসুলভ সঙ্কীর্ণতা, পূর্বগামীদের বিস্মৃত হওয়ার ঝোঁক।

ছোট গণ্ডির মধ্যে গবেষণা অবশ্য ইতিহাস-চর্চায় অপরিহার্য। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকাটা কি বাঞ্ছনীয়? নানা স্তরে ইতিহাসের আলোচনা কি সার্থক নয়? ইতিহাস-রচনায় নানা মহল থাকাটাই সঙ্গত। আজকের দিনে ঐতিহাসিকদের প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সামান্য বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান। কিন্তু সেই পরিধি ছাড়িয়ে ব্যাপক ক্ষেত্রে ইতিহাসের ধারায় সমগ্র রূপ নির্ণয়ের চেষ্টাও অসঙ্গত হবে কেন? বিশেষজ্ঞদেরও মনে রাখা উচিত দার্শনিক ডেকার্ট-এর সেই প্রসিদ্ধ উক্তি যে অতীতের কোনো অংশই নিখুঁতভাবে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়, কেননা সব সময়ই অনেক কিছু তথ্যকে বাদ দেওয়া ছাড়া গতি নেই। ইতিহাসে ব্যাপক দৃষ্টি এক হিসাবে বাস্তবকে বিকৃত করে দেখা বটে, কিন্তু সঙ্কীর্ণভাবে বিশেষজ্ঞের দেখবার ভঙ্গিটাও তো আর এক ধরনের বিকৃতি মাত্র। ব্যাপকভাবে দেখার একটা সার্থকতাও আছে, দূর থেকে অথবা উপর থেকে যেমন একটা প্রবাহকে দেখলে তার সাধারণ রূপটুকু চোখে ধরা পড়ে। বিজ্ঞানের মতন ইতিহাসের বেলাতেও একটা সমগ্র দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

আইন্‌স্টাইনের মতে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নিবদ্ধ মনের কাছ থেকে মহৎ আবিষ্কার প্রত্যাশা করা চলে না। আর আধুনিক ঐতিহাসিকদের গুরু রাঙ্কে স্বয়ং বলতেন যে প্রসারিত দৃষ্টি না থাকলে গবেষণা পর্যন্ত নিষ্প্রাণ হয়ে পড়তে বাধ্য।

কোনও কোনও সমালোচক টয়েন্‌বির ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিকে 'বামপন্থী-বিচ্যুতি' বলে বিদ্রূপ করেছেন। অথচ ইতিহাসের সুমহান ঐতিহ্যে তাঁর পূর্বসূরীদের অভাব দেখি না। গ্রীসের হেরোডোটাস, থিউকিডিডিস, পলিবিয়াস থেকে আধুনিক যুগের গিবন, রাঙ্কে, মায়ার পর্যন্ত মহারথীদেরও কি উপেক্ষা করতে হবে? এঁদের উপেক্ষা করতে গেলে ইতিহাস-সাহিত্যের কতটুকুই বা বাকি থাকে?

চার

প্যাটার্নের অনুসন্ধানও কি ইতিহাসের অন্তরঙ্গ অঙ্গ নয়? বাস্তবকে ধরবার চেষ্টা মাত্রই এক হিসাবে অবাস্তব বটে, কিন্তু ছোট বড় যে-কোনও আলোচনাতেই তো সে-দোষ বিদ্যমান। অথচ ইতিহাস তো কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনার কারবার হতে পারে না, যার মধ্যে কোনও যোগসূত্র দেখার চেষ্টা চলবে না, যেখানে একটার পর একটা নিরর্থক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে? আমরা যাকে 'ঘটনা' বলি, তাও তো আমাদের দেখার উপর নির্ভর করে, আর সে-দেখাই কি বাস্তবপূর্ণ সত্য? অগণিত ঘটনা বা ফ্যাক্ট সম্বন্ধে কোনও কিছু বলতে বা লিখতে যাওয়া মাত্র আমাদের বাছাই করে নিতে হয়, সেই বাছাই আবার নির্ভর করবে আমাদের মনের ধারণার উপর। এমন কি ফ্যাক্ট সংগ্রহ করতে গেলেও সংগ্রাহকের মনের প্রত্যাশা ও আগ্রহকে বাদ দেওয়া অসম্ভব। ইতিহাসে দৃষ্টিভঙ্গিকে যাঁরা উপহাস করেন তাঁরা ভুলে যান যে ব্যাপক অথবা সঙ্কীর্ণ যে-কোনও ধরনের ইতিহাস-রচনায় দেখার ভঙ্গি একটা থাকবেই—অবশ্য কোনও কোনও সময় লেখক সে-সম্বন্ধে সজাগ থাকেন না। তথ্যের উপর তথ্য চাপিয়ে গেলেই ইতিহাস রূপগ্রহণ করে না, তার জন্য চাই তথ্য নির্বাচন, তাকে সাজানো, যোগসূত্র সন্ধান, ছোট বড় সিদ্ধান্ত। দৃষ্টিভঙ্গি ও থিওরির সার্থকতা এই যে তার অনুষঙ্গে সুপরিচিত ফ্যাক্টও নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যেমন হয়েছিল কোপানিকাস অথবা ডারুইনের পরিকল্পনার প্রভাবে।

ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে মেনে নেওয়াই ভালো। পুনরাবৃত্তি আছে বলেই ধারা অথবা প্যাটার্নের সন্ধান চলতে পারে, সেই সন্ধানের ফলেই কেবল ছোট বড় ইতিহাস-রচনা সম্ভব হয়ে ওঠে। অনেক ঐতিহাসিক বলতে ভালোবাসেন যে ঘটনামাত্রই হলো আকস্মিক ও পরিপূর্ণভাবে নূতন কিছু, অন্য কোনও ঘটনার সঙ্গে তার তুলনা চলে না। এ কথা সত্য হলে ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগ লোপ পেতে বাধ্য, কোনও কিছুই তাহলে বোধগম্য হতে পারে না, বুদ্ধিবিচার তাহলে নিরর্থক প্রতিপন্ন হয়। আসলে স্বয়ংসম্পূর্ণ একক ঘটনা কি বিজ্ঞানের রাজ্যে, কি মানুষের জীবনে বা ইতিহাসে সুলভ নয়। মহৎ ব্যক্তি ইতিহাস সৃষ্টি করলেন যখন বলা হয় তখন আমরা ভুলে যাই যে মহত্তম লোককেও সৃষ্টি করে তাঁর যুগ, তাঁর সাফল্যের পিছনে থাকে অতীতের সাধনা ও বর্তমানের যথাযোগ্য পরিবেশ।

১৯৫৪ সালে আমেরিকায় যে ইতিহাসবিদ্যা-কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছিল তাতে দেখতে পাই এই সিদ্ধান্ত যে ইতিহাস-চর্চা করতে গেলেই কিছুটা প্রাথমিক সূত্র বা প্রকল্প ছাড়া এগনো যায় না, বাস্তব তথ্য দিয়ে সেই প্রকল্প পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে চলতে হয়—ঠিক যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। থিওরি-বিশেষকে সমালোচনা করা সম্ভব, কিন্তু পদ্ধতিটা অপরিহার্য। যে-প্রাথমিক ধারণাগুলি ইতিহাসের আলোচনায় হাতিয়ারের কাজ করে, বিজ্ঞানে নূতন থিওরির মতন অনেক সময় তার উৎপত্তি উজ্জ্বল কল্পনার রাজ্যে। প্রথমে সমস্ত তথ্যসংগ্রহ, পরে থিওরি, জ্ঞানের জয়যাত্রা ঠিক এভাবে আসে না। ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি সেইজন্য এত মূল্যবান। যুগের ধ্যানধারণা ঐতিহাসিক মাত্রকেই প্রভাবান্বিত করে, সেইজন্যই যুগে যুগে ইতিহাস লেখার ধাঁচও বদলে যায়। ইতিহাস-লেখক সমকালীন নানা চিন্তাস্রোতের উপরে উঠে গিয়ে নিরপেক্ষ বিচারক হয়ে বসেন এই ধারণা শুধু নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা। নিজস্ব ঝোঁক ও প্রাথমিক ধারণা সম্বন্ধে সজাগ থাকাটাই হলো যুক্তিসঙ্গত।

ইতিহাসে ব্যাপক ব্যাখ্যা ঠিক সম্পূর্ণ 'প্রমাণিত' হতে পারে না। কিন্তু তার কাজই হলো খসড়া চিত্র আঁকা, সর্বাংশে নিখুঁত ফোটোগ্রাফি নয়। ছবিতে যেমন কিছুটা বিকৃতি থাকবেই, অথচ তার মধ্য দিয়েই অন্তর্নিহিত সত্যের আভাস পাওয়া যায়, এখানেও তাই। ঐতিহাসিক অন্তর্দর্শী চিত্রকরের

মতন। টয়েন্‌বির ঐতিহাসিক প্যাটার্নের সন্ধান তাই পণ্ডশ্রম নয়, তাঁর পদ্ধতিকে উপহাস করে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

ব্যাপক ব্যাখ্যার ছক আঁকার প্রয়াসকে ঐতিহাসিক ফিশার একদা বিদ্রূপ করেছিলেন এই বলে যে ইতিহাস হলো একটা আকস্মিক ঘটনার পর আর একটা আকস্মিক ঘটনার আবির্ভাব মাত্র, সুতরাং কোনও সাধারণ সিদ্ধান্ত বা ছক এখানে অচল। সেই ফিশার-ই আবার নিজের লেখা ইতিহাসে কিন্তু বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত, প্যাটার্ন ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন—কারণ তাঁর দার্শনিক বিশ্বাস সত্য হলে কোনও ইতিহাস রচনাই চলতে পারে না। ব্যবহারিক কাজে এক পদ্ধতি, দর্শনের বেলায় অন্য বুলি—এর দৃষ্টান্ত তো বৈজ্ঞানিক মহলে সুবিদিত। বাটারফিল্ড ঠিকই বলেছেন যে ঐতিহাসিক যখন নিজের বিশ্বাস-ধারণা সম্বন্ধে সতর্ক না থেকে মনে করেন যে তিনি এসব কিছুর উর্ধ্বে বিরাজ করছেন তখন তাঁর অন্ধতার পরিমাণ হয় অসীম।

পাঁচ

টয়েন্‌বির সংগৃহীত তথ্যের সম্ভারও বিপুল। পরবর্তী কোনও বড় ঐতিহাসিক হয়তো সে-তথ্যের আরও বেশি সদ্ব্যবহার করবেন, কিন্তু আপাতত এ-কাজের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা পাঠকের পক্ষে শোভন হবে। মূল 'আলোচনা'র টুকরা টুকরা খণ্ড-আলোচনাগুলি নিঃসন্দেহে উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছে—শেষ বইখানিতে যেমন রোম, ইস্‌লাম, সিরিয়া অথবা য়িহুদি ইতিহাসের পর্যালোচনা নানা চিন্তার উদ্রেক করবেই। এই ধরনের লেখায় টয়েন্‌বি দেখিয়েছেন তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান—শুধু বিশাল চিত্র-অঙ্কনে নয়, খুঁটিনাটি কাজের কারুকার্যেও তাঁর দখল অসামান্য। মনে রাখা উচিত যে 'ইতিহাসের আলোচনা'র লেখকের ছোট পরিধিতে সীমাবদ্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খ ঐতিহাসিক লেখার সংখ্যাও শতাধিক। অর্থাৎ ইতিহাসের বিভিন্ন মহলে তাঁর সমান পারদর্শিতা আছে।

অবশ্য 'ইতিহাসের আলোচনা' শেষপর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান ও চিন্তার প্রতিফলন মাত্র, ইতিহাস সম্বন্ধে শেষকথা নয়। এর মালমশলা আরও বিস্তার করে ভবিষ্যতে সফলতর পরিকল্পনা খুবই সম্ভব। ইতিহাস-রচনা সাময়িক কীর্তি বটে, কারণ জ্ঞানের পরিধি ও দেখবার ধরন বদলে চলে।

কিন্তু যে-লেখা চিন্তার খোরাক জোগায় সে নিশ্চয় দীর্ঘায়ু। সে-সম্মান টয়েন্‌বির প্রাপ্য বলেই আমি নিঃসঙ্কোচে দাবি জানাই। আর আজকের দিনে ইতিহাস লেখা হয় এমন নিরস নিষ্প্রাণ রীতিতে যে টয়েন্‌বির সুপাঠ্য, সুচিন্তিত, সুগভীর, সুসমৃদ্ধ রচনা কম লাভ নয়। ঐতিহাসিক সাহিত্যের মহান ঐতিহ্য টয়েন্‌বি আর একবার আমাদের সামনে তুলে ধরলেন।

ছয়

টয়েন্‌বি-বাদী হওয়া অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ সিদ্ধান্ত আমার কাছে অগ্রাহ্য মনে হয়। দুটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া যাক—তাঁর ধর্মীয় ঝোঁক এবং ইতিহাসে গতির রূপকল্পনা।

বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী মনের মধ্যে অবশ্য দুস্তর পার্থক্য আছে, কিন্তু টয়েন্‌বি যাকে অপার্থিব দৃষ্টি, যুক্তির পরপারে উত্তরণ (trans-rationalism) বলেছেন, ইহজাগতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যায় তার আমদানি কি সত্যই অনিবার্য? যুক্তিতর্কে সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা হয়তো বা সম্ভব নয়, যদিও বিজ্ঞানের নজিরে বলা যায় যে তেমন ব্যাখ্যার বিস্তার আজকের দিনে একটা সহজ সত্য। যার ব্যাখ্যা আজ নাগালের বাইরে, তাকে ভবিষ্যতের আশায় একপাশে সরিয়ে রাখলেই চলে; তাকে বোঝার জন্য বুদ্ধির অগম অজ্ঞেয় কোনও রহস্যকে টেনে আনার প্রয়োজন কোথায়? বিজ্ঞানে যতখানি জানা যায় তার বাইরেও কিছু জানার আকাঙ্ক্ষাটা স্বাভাবিক; কিন্তু অধীর হয়ে সে-আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য এমন কল্পনার আশ্রয় নেব কেন যার প্রকৃতিই হলো তর্কাতীত? বাস্তব-পূর্ণ-সত্য হয়তো মানুষের জ্ঞানের অগম্য, কিন্তু আংশিক সত্য তো আমাদের আয়ত্তে এবং তার পরিমাণ দিনে দিনে বেড়ে চলে। সেক্ষেত্রে পিছনের দরজা দিয়ে যুক্তির পরপারে ধ্রুব বিশ্বাসের রাজ্যে লাফ দেওয়ার সার্থকতা কতটুকু? অর্থবিদ্যা, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব অথবা পুরাতত্ত্ব যদি যুক্তিনির্ভর হাতিয়ার মাত্র সম্বল করে এগোতে পারে, তবে ইতিহাসের বেলায় কেন অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টির জন্য এত আগ্রহ?

প্রাথমিক ধারণা নিয়ে ইতিহাস আলোচনার যাত্রা শুরু হয় সত্য, কিন্তু বাস্তব ঘটনার কষ্টিপাথরে তাকে পদে পদে যাচাই করে নিতে হয়। যুক্তির

পরপারে উত্তরণে বিশ্বাস থাকলে এই যাচাই করাটা ব্যাহত হতে বাধ্য। 'উচুদরের ধর্ম' (খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি) সম্বন্ধে টয়েন্‌বির অগাধ আস্থা তাই ইতিহাস-নির্ভর হতে পারে নি। অতীন্দ্রিয় কোনও রহস্যের অস্তিত্ব এবং তার সঙ্গে সংযোগের সন্ধান—উঁচুস্তরের ধর্মের এই লক্ষণ তো উঁচু নিচু সকল ধর্মেরই সাধারণ প্রকৃতি। বিস্তৃতির পার্থক্যটাও দুই ধরনের ধর্মের ভেদরেখা টানতে পারে না। প্রভাবের দিক থেকে সকল ধর্মেরই কম বেশি কার্যকারিতা চোখে পড়ে, কিন্তু প্রভাব থেকে সত্যতা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং উচ্চতর ধর্মের আবির্ভাব হলো ইতিহাসের প্রধানতম ঘটনা, এমন কথা নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বাইরে কিছু নয়, যাচাই করে তাকে প্রমাণ করা যায় না। তথাকথিত শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির শ্রেষ্ঠত্বও অনেকখানি অনৈতিহাসিক, তাদের ঐতিহাসিক রূপটা ভালো-মন্দের সংমিশ্রণের বিচিত্র কাহিনী, মানুষের অপরাপর কীর্তির তুলনায় তারা কিছু ভিন্ন গোত্রের উদ্যম নয়। টয়েন্‌বি পর্যন্ত মহত্তর ধর্মের অতীত প্রকাশ থেকে ভবিষ্যতের কল্পনার দিকেই ঝুঁকেছেন, কিন্তু এদের তিনি যে-রূপ দিতে চেয়েছেন বিশ্বাসী ভক্তরা তা কখনোই মেনে নেবে না। মহত্তর সকল ধর্মই নাকি সারসত্যের আংশিক প্রকাশ, কিন্তু ইতিহাসে তাদের পরস্পরবিরোধিতাই তো বেশি প্রকট। সর্বধর্মসমন্বয় অলীক কল্পনা, প্রত্যেক ধর্মই একটা ঐতিহাসিক সত্তা, কাজেই জোড়াতাড়া দিয়ে জামা-সেলাই-এর মতন নূতন ধর্ম বানানোও সম্ভব নয়। ধর্মকে মানুষের প্রধান উদ্যম বলাটা অবাস্তব, অগণিত মানুষের পার্থিব জীবনসংগ্রাম কোনোক্রমেই তার থেকে কম কিছু বলা চলে না। ধর্মের মৌলিক অর্থ তো সমাজকে যা ধারণ করে রাখে, সেই ধারকশক্তির অবশ্যই একটা প্রয়োজন আছে। কিন্তু ভবিষ্যতের মানব-জগৎকে ধরে রাখবে মানবিকতা ও সামাজিক সুবিচার, একথাই বা অগ্রাহ্য করব কিসের জোরে?

সাত

ইতিহাসের সাধারণ গতি সম্বন্ধে টয়েন্‌বির ধারণাও স্পষ্ট বা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। মানুষের আচরণের স্বাধীনতায় তাঁর মজ্জাগত বিশ্বাস—সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব থেকেই এর উৎপত্তি। অথচ সে-স্বাধীনতারও সীমানা নির্দিষ্ট হয় পরিবেশ দিয়ে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। মানুষের ব্যবহার যথেচ্ছ,

তার বাধ্যবাধকতা নেই, কোনও challenge-এর response কি হবে তার কোনও কিছু নিশ্চয়তা নেই, এ-সব কথার অর্থই হলো ইতিহাসে কার্য-কারণ নির্ণয়ের পরিহার। আবার সভ্যতাসমূহ 'সমসাময়িক', এ-তত্ত্বের পরিণতি হলো ইতিহাসকে পাশাপাশি স্বতন্ত্র নানা স্রোতের সমষ্টি হিসাবে কল্পনা করা। সকল সভ্যতার মধ্যে একই জাতীয় ছকের অনুসন্ধান আবার ইতিহাসের গতিকে পর্যবসিত করে চক্রাবৃত্তির ধারণাতে। টয়েন্‌বির এমন সব বিশ্বাস অযৌক্তিক মনে করার যথেষ্ট হেতু রয়েছে।

ইতিহাসের গতি সরলরেখায় চলে না, কিন্তু আঁকাবাঁকাভাবে এগিয়ে চলা সম্ভব। অগ্রগতিকে কম্বুরেখা (spinal) রূপে কল্পনা তাই সঙ্গত বলেই মনে হয়। টয়েন্‌বি প্রগতিতে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে টুকরো টুকরো অগ্রগতি তিনি মেনে নিয়েছেন। এই সব নানা ধরনের অগ্রগতি যদি সকলেই তুল্যমূল্য না হয়, তবে তাদের সংমিশ্রণে এক সমাজ থেকে অন্য সমাজ উন্নততর হওয়াটা সম্পূর্ণ সম্ভব। ইতিহাসে প্রগতিও তাহলে অবিশ্বাস্য কিছু নয়। বস্তুত টয়েন্‌বি যখন বলেন যে সভ্যতার এতদিনকার ইতিহাস উচ্চ ধর্মের জয়যাত্রার প্রস্তুতি মাত্র, তখন প্রকারান্তরে তিনি ঐতিহাসিক প্রগতির আশ্রয় নিচ্ছেন না কি ?

স্বকীয় দর্শনে আবদ্ধ থেকে টয়েন্‌বি বুঝতে চান নি যে ইতিহাসে স্তরভেদ আছে, মানুষ উন্নতির সোপান বেয়ে চলতে পারে। গর্ডন চাইল্ডের অনুসরণে তিনি প্রাক্-সভ্যতার যুগে আর্থিক অগ্রগতিটুকু এখন মেনে নিয়েছেন, সভ্যতার আগমনে তিনি সে-বিশ্লেষণ অযথা বর্জন করলেন। টনি তাই ঠিকই বলেছিলেন যে বিভিন্ন সভ্যতার প্রসার ও অবক্ষয়ে টয়েন্‌বি আর্থিক বিচারের দিকে নজর দেন নি। আধুনিক জগতে বিজ্ঞান ও ধনবাদের প্রভাব তাই তিনি দেখতে চান নি, সমাজতন্ত্রও তাঁর কাছে নূতন উন্নততর সমাজের আভাস এনে দেয় নি।

মার্কসের সঙ্গে টয়েন্‌বির সাদৃশ্য অনেকে লক্ষ্য করেছেন। সাদৃশ্য হলো ব্যাপক মানবিক দৃষ্টিতে, ইতিহাসের প্যাটার্ন বা ছন্দ অনুসন্ধানে, ইতিহাসের অর্থ সম্বন্ধে কৌতূহল আবাহনে। পার্থক্য অবশ্য সুদূরপ্রসারী। সে-পার্থক্য প্রধানত ধর্মের উপর সীমাহীন গুরুত্ব আরোপে, অর্থাৎ মুক্তির পরপারে উত্তরণের প্রয়াসে, এবং ইতিহাসের গতি সম্বন্ধে অনৈতিহাসিক বিশ্বাসের মধ্যে। টয়েন্‌বির লেখা সেদিক দিয়ে মূলত খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস ও ভাববাদ সঞ্জাত মার্কসকে উত্তর দেবার চেষ্টাবিশেষ। এখানে তাঁর সাফল্য একেবারেই তর্কাতীত নয়।

A Study of History, Vol. XII: Reconsiderations. Arnold Toynbee. Oxford University Press, 1961.

আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ

অশোক রুদ্র

প্রবন্ধটির প্রথমভাগ শেষ করেছিলাম এই বলে যে আমাদের অর্থনৈতিক প্রগতিটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ছোটা, এইটুকু মাত্র বলে থেমে গেলে বক্তব্যটা অত্যন্ত একপেশে হয়ে যায়। দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে এই প্রগতির অন্য একটা পাশও ধরা পড়বে। এবার সেই অন্য পাশটার দিকে আমাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে পাঠানো যাক। তাতে সবচেয়ে বড় যে সত্যটা ধরা পড়ে তা এই যে জাতীয় আয় প্রভৃতি সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে মাপলে প্রগতিটা যত সামান্যই হোক না কেন, ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে এমন কিছু কিছু গুণগত পরিবর্তন এসেছে এবং আসছে যা একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়। এই গুণগত পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কথা যা তা এই যে একটি বিশেষ অর্থে ভারতীয় অর্থনীতি সত্যিই স্বাবলম্বী হতে যাচ্ছে। আমরা এর আগে মন্তব্য করেছি, সাড়ে তিনহাজার কোটি টাকার ঋণ ১৮০০০ কোটি টাকার ঋণে পরিণত হয় যে উন্নয়নের পদ্ধতিতে তার মারফৎ অর্থনীতি স্বাবলম্বী হতে যাচ্ছে বলাটা খানিকটা মস্করার মতো শোনায় নাকি? আমাদের আগেকার এই উক্তি এবং এখনকার উক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা বাস্তবেরই এক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের দুইটি অঙ্গ। একটি হলো পুঁজির অনাভাব। অপরটি উৎপাদনের মালমশলা ও কৌশলের অনাভাব। আমরা যে পরমুখাপেক্ষী তার এক কারণ আমাদের যথেষ্ট পুঁজি নেই; দ্বিতীয় কারণ, যথেষ্ট পুঁজি থাকলেও তা ব্যবহার করে সবকিছু উৎপাদন করার যোগ্যতা আমাদের নেই। আমাদের যে বিদেশী সাহায্য নিতে হয় তার সংখ্যাতাত্ত্বিক মাপ একটি হলেও তার গুণগত প্রকৃতি দুইটি। একটি হলো এই যে তা পুঁজি; অপরটি এমন যন্ত্রপাতি, এমন মালমশলা, এমন কারিগরি বিদ্যা যা আমাদের দেশে যথেষ্ট সুলভ নয় বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই অলভ্য। ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা করতে যে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হচ্ছে তার একটা

কারণ এই যে এই ধরনের শিল্পে যে ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তা আমরা নিজেরা উৎপাদন করতে পারি না। যা নিজেরা উৎপাদন করতে পারি না অথচ যা আমাদের প্রয়োজন তাকে আমদানি করতে হয়। কিন্তু আমদানির তুল্যমূল্য রপ্তানি করার যোগ্যতাও আমাদের নেই। আমরা যা উৎপাদন করি তা অধিকতর মূল্যে বা অধিকতর পরিমাণে ক্রয় করার আগ্রহ আমাদের আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের নেই। অতএব আমাদের আমদানি করতে হয় এমন অনেক কিছু রপ্তানির মারফৎ যার মূল্য আমরা দিতে পারি না। তাই নিতে হয় বৈদেশিক সাহায্য। কিন্তু শুধু এই কারণেই বৈদেশিক সাহায্য নিতে হয় মনে করাটা মারাত্মক ভুল। আমদানির সমপরিমাণ রপ্তানি যদি করতে পারতামও তো শুধু সেই কারণেই আমাদের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন মিটে যেত না। কিন্তু এই মারাত্মক ভুলটাই ভারতবর্ষের পরিকল্পনাকাররা করে বসেন যখন তাঁরা আর দশ পনেরো বৎসরের মধ্যে স্বাবলম্বনের স্বপ্ন দেখেন। তাঁদের ভুলের ভিত্তিটা এই যে আর পনেরো বৎসরের মধ্যে ভারীশিল্পের পত্তন এতদূর এগিয়ে যাবে যে এমন মালমশলা বা কারিগরি বিদ্যা খুব কমই থাকবে যা কিনা দেশের ভিতরেই উৎপাদিত হতে পারবে না। সেক্ষেত্রে আমদানির উপর নির্ভরতা কমে যাবে এবং আমদানি রপ্তানির ভারসাম্যের অভাবের দরুণ যে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন তা-ও অন্তর্হিত হবে। কিন্তু পুঁজির অভাবজনিত যে প্রয়োজন তা সমপরিমাণেই বিদ্যমান থাকবে। এই পুঁজির অভাবের আঁকটাই আমরা আগের অধ্যায়ে পরিবেশন করেছিলাম। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনাকাররা যেমন পুঁজির দিকটায় না তাকিয়ে একপেশে হয়েছেন, তেমন আমরাও শুধু পুঁজির দিকে তাকালে একপেশে হব। অর্থাৎ, পুঁজির দরুণ পরমুখাপেক্ষিতা কমবে না একথা সত্য হলেও মালমশলা যন্ত্রপাতি এবং কারিগরি বিদ্যার দরুণ পরমুখাপেক্ষিতা যে প্রায় লোপ পাবে তা অর্থনীতিতে একটা বিশাল গুণগত পরিবর্তন সূচিত করবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কীর্তি তা হলো লোহা ও ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণের গোড়াপত্তন। এই লোহা ও ইস্পাত শিল্পের ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় যন্ত্রনির্মাণ শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে। সোভিয়েত-সাহায্যে রাঁচি এলাকায় যে যন্ত্রনির্মাণের কারখানা স্থাপিত হচ্ছে তা প্রতি বছর একটি করে ১ মিলিয়ন টনের ইস্পাত

কারখানার সমুদয় যন্ত্রপাতি উৎপাদন করতে পারবে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের বিকাশ যে কতদূর এগিয়ে যাবে তার খানিকটা আন্দাজ নিচের তালিকা থেকে পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যেহেতু অতিকায় এবং তার বৃদ্ধির হারও যেহেতু অত্যধিক, সেইহেতু মাথাপিছু কি জোটে না জোটে বা কি হচ্ছে না হচ্ছে তার হিসেব করলে অনেক জিনিসই অত্যন্ত নগণ্য ঠেকে। কিন্তু জীবনমানের গণনায় মাথাপিছু হিসেবই যথাযোগ্য হলেও অর্থনীতির গুণগত প্রগতির হিসেবে তা সবসময়ে শ্রেষ্ঠ মাপ নয়। এবং অন্যান্য বহু ক্ষুদ্রতর আয়তনের উন্নত অর্থনীতির দেশের সঙ্গে তুলনা করলে গুণগত দিক থেকে ভারতের অর্থনীতির শক্তি ও সামর্থ্য যে ১৯৭৫ সালে একেবারে তুচ্ছ হবে না তা মানতেই হয়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

	১৯৬০-৬১	১৯৭৫-৭৬
ইস্পাত	২½ মিলিয়ন টন	১৮ মিলিয়ন টন
লোহা	০·৯ মিলিয়ন টন	৪ মিলিয়ন টন
এ্যালুমিনিয়ম	১৮,০০০ টন	২৫০,০০০ টন
তামা	৯,০০০ টন	৩৫,০০০ টন
কয়লা	৬০ মিলিয়ন টন	২০০ মিলিয়ন টন
বিদ্যুৎ	৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট্	২৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট্
সিমেন্ট	৯ মিলিয়ন টন	৩০ মিলিয়ন টন
রাসায়নিক সার	২০০,০০০ টন	২·৫ মিলিয়ন টন
বস্ত্র (কার্পাস)	৭৫০·কোটি গজ	১২০০ কোটি গজ

দ্বিতীয় যে গুণগত পরিবর্তন প্রণিধানযোগ্য তা হলো কৃষির অর্থনৈতিক কাঠামোতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অদলবদল। কংগ্রেসী ভূমিসংস্কার ভূমিসমস্যার মূলে হাত দেয় নি। কংগ্রেসরাজ ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে জনসাধারণকে বঞ্চনা করেছে—এ সবই ঠিক। কিন্তু কংগ্রেসী ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনীশক্তিগুলির কোনোই বিকাশ হয় নি বা হবে না; একথা বলাটা বড় রকমের ভুল হবে। গত দশ বৎসরের কৃষির ইতিহাসে নজর করে দেখলে দুইটি বিপরীত ধারা লক্ষ্য করা যায়। এক হলো শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাফল্য; অপরটি হলো পুঁজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অসাফল্য।

শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষি মোটের উপর সফল হয়েছে এ কথাটায় অনেক পাঠকই জোর আপত্তি করবেন। একথা ঠিক এখনও বিদেশ থেকে শস্য আমদানি করতে হচ্ছে ; একথা ঠিক গত দশ বছরে বার বার খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি জনসাধারণের শ্বাসরোধকর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এও সত্যি যে এমন বছরও গেছে যখন চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন হয়েছে, মূল্য হ্রাসও ঘটেছে। উৎপাদনবৃদ্ধি যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়তো হয় নি। কিন্তু উৎপাদনবৃদ্ধি একেবারে কিছু হয় নি তা-ও ঠিক না। ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা এমনই একটা পর্যায়ে রয়েছে যে উৎপাদনীশক্তিগুলির কোনো সম্প্রসারণই তার মধ্যে আর সম্ভব নয়। এ-জাতীয় একটা প্রস্তাব প্রায়ই বামপন্থীমহলে শোনা যায়, কিন্তু তার তথ্যভিত্তি কি আছে তা গভীর অনুধাবন সাপেক্ষ। কংগ্রেসরাজ যে ধরনের ভূমিসংস্কার করেছে তার দ্বারা এমন একটি শ্রেণী কৃষির ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে যা সম্পূর্ণই পরভৃত্তিকাজ্ঞাতীয় নয়, যার মধ্যে বুর্জোয়া অন্ত্রপ্রনর (entrepreneur)-এর লক্ষণ খানিক আছে। কম্যুনিটি ডেভলপমেণ্ট প্রভৃতি নানা সাদা হাতির মারফৎ অপচয় প্রচুর হয়ে থাকলেও কৃষির উপকারও একেবারে কিছু হয় নি তা ঠিক নয়। সেচের জল অনেক অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু অনেকাংশে তা ব্যবহৃতও হচ্ছে ; কাজের সুবিধা যত দেওয়া হচ্ছে কৃষিব্যবস্থার প্রতিকূলতার দরুণ কৃষকেরা তার সবটা ব্যবহার করে উঠতে পারছে না—ঠিক, কিন্তু এই সরকারী খাতের অনেক টাকাই যে এইভাবে কৃষিতে পুঁজি নিয়োগের কাজে লেগেছে তা-ও ঠিক। রাসায়নিক সার যে-পরিমাণ সরবরাহ হয়েছে তার চতুর্গুণ পরিমাণ চাহিদা কৃষকদের কাছ থেকে এসেছে। এতটা সেচের জল, এতটা কর্জ, এতটা রাসায়নিক সার যে জমিতে অনুপ্রবেশ করেছে তা ফল না দিয়ে যেতেই পারে না। আর তা জমিতে অনুপ্রবেশ করেছে এই কংগ্রেসীরাজের নয়া জমনার কাঠামোতেই। এখানে প্রশ্ন ওঠে, গত দশ বছরে যেটুকু বিকাশ দেখা গেছে তা কি স্থায়ী হবে, নাকি সে বিকাশ কিছুদিনের মধ্যেই অবরুদ্ধ হয়ে যাবে? ভারতবর্ষের কৃষিতে যেটুকু বিকাশ দেখা যাচ্ছে তা অত্যন্ত ক্ষীণপ্রাণ, আশু-ভবিষ্যতে তা বিপুল আকার ধারণ করবে এমন কোনো সম্ভাবনাই নেই, কিন্তু তা যে সম্পূর্ণই অবরুদ্ধ হয়ে যাবে তা-ও বলা যায় না। মনে হয় এখনকার মতো শীর্ণ ধারার প্রগতিই আরও বিশ পঁচিশ বছর অন্তত চলবে।

তার পরের কথা বলা যায় না। কিন্তু যা গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে এই প্রগতির হার এত ক্ষীণ হবে না যে অর্থনৈতিক প্রগতির হারকেও তার দরুন কমতে হবে। প্রবন্ধটির আগের অধ্যায়ে অর্থনীতির সামগ্রিক প্রগতির হার কতটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার আলোচনা করেছি। এই বিশেষ হারটি—যা অবশ্যই অতি সামান্য—অর্জিত হওয়ার জন্য কৃষির প্রগতি-হারের যে প্রয়োজন, তা কৃষি অর্জন করতে সমর্থ হবে বলে আমার মনে হয়।

বাস্তবিকপক্ষে সামগ্রিক অর্থনীতির প্রগতির হার যে এত কম তার জন্য কৃষির উৎপাদনের প্রগতির হার খুব বেশি দায়ী নয়। এ কথাটাতেও অনেকে চমকে উঠবেন, কারণ কৃষির পিছুটানই সমগ্র অর্থনীতির প্রগতিকে ব্যহত করে—একি মার্কসীয় অর্থনীতির একটি অন্যতম প্রধান সূত্র নয়? ঠিক বটে, কিন্তু আমাদের সাম্প্রতিক অর্থনীতির অবস্থাটা এরকমই যে এ কথা বলা যায় না যে কৃষিতে উৎপাদন যদি আরও বেশি হতো তাহলেই অর্থনীতির প্রগতির হারকে বাড়ানো যেত। অন্যভাবে ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, কৃষির উৎপাদনের যে বর্তমান হার তার সঙ্গে তাল রেখেই অর্থনীতি আরও অনেক বেশি হারে প্রসারিত হতে পারত, যদি অন্য বাধা না থাকত। কারণ কৃষির মূল যা পণ্য, অর্থাৎ খাদ্যশস্য, তার সত্যি কোনো ঘাটতি দেশে এখন আর নেই, বেশ অনেক বছরই নেই। তা সত্ত্বেও যে প্রায়ই টানাটানি হয়, মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, তার প্রধান কারণ কালোবাজারি কারবার তো বটেই, তাছাড়া অন্য একটি কারণ এই যে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল তারা খাদ্যশস্য খায় সাধারণের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে। মাথাপিছু প্রয়োজন হিসেবে গণনা করলে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন যতটা হওয়া দরকার তার চেয়ে কম তো নয় বরং খানিক বেশিই উৎপাদন হচ্ছে। অর্থনীতির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্যের বদলে অন্য জিনিস খাওয়ার বা ব্যবহার করার অভ্যাস ধীরে ধীরে ছড়াবে। সুতরাং খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজন শুধুমাত্র জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারে, অর্থনীতির প্রগতির হার যাই-ই হোক না কেন!

কিন্তু কৃষির পিছুটান যে অর্থনীতির প্রগতির সামগ্রিক হারকে নিচে ধরে রাখছে না তা বলা হচ্ছে না। কৃষির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেই শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাফল্য এবং পুঁজির উৎপাদনের ক্ষেত্রে অসাফল্যের কথা বলা হয়েছিল। যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজির অভাবই আমাদের অর্থনৈতিক

প্রগতির মন্থরতার মূল কারণ। আর এই পুঁজির অভাবের অন্যতম মূল কারণই
আমাদের কৃষির অর্থনৈতিক কাঠামো। বর্তমান শাসকশ্রেণীর ভূমিসংস্কারের
পরেও এই মূল সমস্যাটির কোনো সুরাহা হয় নি। কৃষির অর্থনৈতিক কাঠামো
এমনই যে কৃষিতে অর্জিত আয়ের খুব কম অংশই পুঁজিনিয়োগের খাতে যায়।
কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে আমরা দেখেছি, কিন্তু তার জন্য যা পুঁজি নিয়োগ
করতে হয়েছে তার বেশির ভাগই এসেছে কৃষির বাইরে থেকে। কৃষি যদি
স্বাবলম্বী হতে পারত, কৃষির জন্য যদি সরকারী খাতে বিপুল পরিমাণ
পুঁজি নিয়োগ করতে না হতো তো সেই পুঁজি দিয়ে শিল্পের উন্নয়নকে আরও
অনেক গতিশীল করে তোলা যেত। কৃষির অসাফল্য এইখানেই।

অর্থনীতির তৃতীয় যে গুণগত পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো
শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনসেবামূলক রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বিপুল সম্প্রসারণ।
আরও অনেক হতে পারত ঠিক, তবু যা হয়েছে, হচ্ছে এবং দশ-পনেরো
বৎসরের মধ্যে হবে তা যে সমাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ গুণগত পরিবর্তন এনে
দিচ্ছে তা অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না। ১৯৫১ সালে প্রাথমিক স্কুলে
যাওয়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের মাত্র ৪৩% স্কুলে যেত, ১৯৬১ সালে সে হার
৬১%-তে পৌছেচে, ১৯৭৫ সালে তা ৯৫%-এ পরিণত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
মাধ্যমিক স্কুলের হার ১৯৫১-তে ছিল ১২'৩%, ১৯৬১ সালে তা ২২'৮%-এ
পৌছেচে এবং ১৯৭৫ সালে তা ৭৫%-এ পৌছতে পারে। হাই স্কুলের হার
এখন মাত্র ১১%, তাকে ৩৩%-এ তোলার চেষ্টা হবে। স্কুল শিক্ষার খাতে
সরকারী ব্যয় ১৯৫১ সালে হয়েছিল ৭১'৫ কোটি টাকা, ১৯৬১ সালে হয়েছে
১৮৫ কোটি টাকা, ১৯৭৫ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ ১০০০ কোটির কাছাকাছি
যাবে বলে অনুমিত হয়। এ হলো চলতি খাতের হিসেব, পুঁজির খাতের খরচ
তো এর উপর আছেই। কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্রের সংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল
১৪০,০০০; ১৯৬১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩২৫,০০০-এ। ১৯৭৫ সালে তা
১৩০০,০০০-এ পৌছতে পারে। ১৯৫১ সালে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষা-
গ্রহণ করে ২৭০০০ ছাত্র; ১৯৬১ সালের সংখ্যা হলো ১০৪,০০০। ১৯৭৫
সালে দেশে ৬০০,০০০-এর বেশি এঞ্জিনিয়ার শিক্ষালাভ করবে। উচ্চ শিক্ষার
চলতি খাতে সরকারী ব্যয় ১৯৫১ সালে ছিল ১৯ কোটি টাকা, ১৯৬১ সালে তা
হয়েছে ৫৪ কোটি টাকা এবং ১৯৭৫ সালে তা ১৭৪ কোটিতে পৌছবার
সম্ভাবনা রাখে। ১৯৫১ সালে ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ৬১,৫০০ নার্সের সংখ্যা

১৬৩,০০০; হাসপাতালে রোগীর বেড্ ছিল ১১৭,০০০। ১৯৬১ সালে
ডাক্তারের সংখ্যা ৮০,০০০-এ; নার্সের সংখ্যা ৩৩০,০০০-এ এবং বেডের
সংখ্যা ২০০,০০০-এ দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৫ সালে অনুমান করা যায় ডাক্তারের
সংখ্যা হবে ২০০,০০০ মতো। নার্সের সংখ্যা হবে দশ লক্ষ এবং হাসপাতালে
বেডের সংখ্যা ৬০০,০০০। আর সংখ্যার রাশি বাড়িয়ে কাজ নেই। এর আগের
অধ্যায়ে যখন আমরা চাল-ডাল-তেল-নুন-লকড়ির মাথা পিছু সংখ্যা পেশ
করেছিলাম তখন জীবনমানের উন্নতি যতটা কম হবে বলে মনে হয়েছিল সেটা
তাহলে খানিকটা একদেশদর্শিতার দরুণ হয়েছিল। জীবনমান তো শুধু তেল-
নুন-লকড়ির হিসাব নয়। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষালাভের সুযোগ কতটা মিলছে
তা-ও জীবনমান বিচারের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কষ্টিপাথর এবং এই কষ্টিপাথরের
বিচারে যে উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে তা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।
বিশেষ করে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তো একটা রীতিমত বিপ্লবই ঘটে গেছে, যদিও
তার জন্য কোনো কৃতিত্বই কংগ্রেসীরাজ দাবি করতে পারেন না। দ্বিতীয়
মহাযুদ্ধের পর থেকে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অবিশ্রান্ত
বেগে অগ্রসর হয়েছে। পেনিসিলিন্, সাল্‌ফা প্রমুখ ওষুধের কল্যাণে পাশ্চাত্য
জগতে অকালমৃত্যু সত্বরই অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হতে চলেছে (যদিও
রাজরোগ ও কর্কটরোগের কোনো যথার্থ প্রতিকার এখনও পাওয়া যায় নি)
এবং তার প্রভাব আমাদের দেশেও গভীরভাবে পড়েছে। এ-প্রভাব শুধু ধনী
মহলেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। সরকারী হাসপাতাল ও ডাক্তারের মারফৎ
দরিদ্রতম পর্যন্ত না হোক অন্তত পক্ষে নিম্নমধ্যবিত্ত পর্যন্ত পৌছেচে।
ম্যালেরিয়া আজ বিদূরিত, কলেরা সহজেই নিরময়, টাইফয়েডের রোগী
সাত-দশদিনে ভাত খাচ্ছে। শিশুমৃত্যু ও প্রসূতি-মৃত্যুর হার নেমেছে।
এই মরণজয়ী বিজ্ঞানের প্রগতির জন্য কৃতিত্ব কার তা এখানে
আলোচ্য নয়। যা প্রণিধানযোগ্য তা এই যে বিজ্ঞানের এই প্রগতি গত
দশ বছরে সাধারণ ভারতবাসীর জীবনমানকে একটি বিশেষ দিকে অনেকখানি
উন্নত করে দিয়েছে এবং এই বিশেষ উন্নতির হার সামনের পনের বিশ বছরে
বাড়বে বই কমবে না।

চতুর্থ ও শেষ গুরুত্বপূর্ণ গুণগত পরিবর্তন হলো মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজের
আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি। মধ্যবিত্ত পাঠক মাত্রেই কথাটি পড়ে প্রবল আপত্তি
বোধ করবেন, কিন্তু অভ্যস্ত ধারণাকে ভেদ করে সত্যের অনুসন্ধান করলে

একথা ধরা পড়বেই যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেটুকু ঘটছে তাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত কিছু প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে। প্রবণতাটি উত্তরোত্তরই বাড়বে। একথা বলা হচ্ছে না যে অন্য সব শ্রেণীর তুলনায় মধ্যবিত্তের সচ্ছলতা বেড়েছে। শ্রমিকজনতা, কৃষিজনতার মধ্যেও কিছু সাচ্ছল্য দেখা দিয়েছে বৈকি। তাছাড়া ধনিক সম্প্রদায় যে দইয়ের নেপোর অংশটি মেরে দিয়েছে তাতো বটেই। শ্রমিক জনতার, কৃষি জনতার এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশ নিশ্চয় আছে যাদের অবস্থার কোনো উন্নতি তো হয়ইনি বরং অবনতিই হয়েছে, তবে মোটের উপর হিসেব করলে সাচ্ছল্য সবকটি শ্রেণীকেই স্পর্শ করেছে মানতে হয়। মধ্যবিত্তের সাচ্ছল্য বৃদ্ধির কয়েকটি দিক একটু আলোচনা করা যাক। প্রথমত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বের প্রকোপ অনেক কমে গেছে। ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে সরকারী চাকুরি বহু পরিমাণে বেড়েছে। ১৯৫০ সালে সরকারী চলতি খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭২৫ কোটি টাকা ; ১৯৬১ সালে তা ১৮২০ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৫ সালে তা ৬০০০ কোটিতে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এ হলো শুধুমাত্র শাসন-ব্যবস্থার এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের খরচের হিসেব অর্থাৎ সরকারী পুঁজি নিয়োগের খরচের হিসেবের বাইরে। সরকারী চাকুরি সৃষ্টির মালটিপ্লায়ার (বা গুণকারক) এক্ষেত্রে বেসরকারী চাকুরি কত সৃষ্টি হয়েছে তার অবশ্য হিসেব নেই, কিন্তু যা হয়েছে তা-ও নগণ্য নয়। গত দশ বছরে প্রচুর স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে, এখনও বাড়ছে। দশ বছর আগে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে ছেলেদের বসে থাকতে হতো, চট্ করে সকলের চাকুরি জুটত না। এখন সে সমস্যা অনেকাংশে অন্তর্হিত হয়েছে, এখন সমস্যা দেখা দিচ্ছে বিপরীত প্রকৃতির—পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ শিল্পী মিলছে না। ডাক্তার, নার্স, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি যে সব বিশেষজ্ঞতার জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাদের দীর্ঘকালীন হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে আগামী পনেরো বছরে এদের অকুলান উত্তরোত্তর বাড়বে। চাকুরির বাইরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিবিধ পেশার বাজারেও চাকুরির সঙ্গে তাল রেখে কারবার ফাঁপছে এবং এ-কারবার অনেকাংশেই ক্ষুদ্র কারবার, এর মুনাফার ভাগী অনেকাংশেই সাধারণ চাকুরেদেরই সমস্তরের সাধারণ মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্ত সাচ্ছল্যের আরেকটা গুণগত গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে সংস্কৃতির উন্নয়নের নামে যে

ধরণের সরকারী সাহায্য ও আনুকূল্য বিতরণ করা হচ্ছে, তার মধ্যে। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের বেতন অনেক বেড়েছে, গবেষণার নামে প্রচুর টাকা পয়সার ছড়াছড়ি করা হচ্ছে। সরকারী তরফ থেকে লেখকদের এবং সঙ্গীত-বাদ্য ও নৃত্য শিল্পীদের উৎসাহ বর্ধনার্থে নানান পুরস্কার, পারিতোষিক ও সম্মান বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছে। এ সবের জন্য লেখক বা শিল্পীদের জীবনমান অনেকটা বেড়ে গেছে তা বলছি না, কিন্তু আপাতত তো জীবনমানের আঁক কষছি না। জীবনমান যে কতটা বেড়েছে এবং কতটা বাড়বার সম্ভাবনা রাখে তার হিসেব আগেই করা গেছে। এখানে শুধু মধ্যবিত্তের মধ্যে এমন এক জাতীয় আপেক্ষিক সাচ্ছল্যের কথা আলোচনা করছি যা মধ্যবিত্তের মানসে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এই বিশেষ দিকটি থেকে বিচার করলে সরকারী আনুকূল্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তার কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের মধ্যে যে ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে এবং উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণ দেখা দেবে তা একেবারেই উপেক্ষনীয় নয়। ১৯৭৫ সালের দিগন্তের দিকে তাকালে দেখব এই প্রবণতার ক্রমবিকাশে মধ্যবিত্ত এমন এক চেহারা গ্রহণ করেছে যা প্রাক্‌যুদ্ধকালের মধ্যবিত্তের থেকে তাকে অনেকখানি আলাদা করে দেয়। ১৯০০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যবিত্তের মধ্যে একটিই ধারা লক্ষিত হয়েছিল, তা হলো তার আর্থিক ক্রমাবনতি। তার জীবনমান হচ্ছিল উত্তরোত্তর খারাপ, পাশ করা ছেলেরা "হা চাকরি, হা চাকরি" করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, শিক্ষা-গবেষণা-সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের নির্মম অর্থকষ্টের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে যেতে হয়েছিল, সামান্য সরকারী আনুকূল্যও তাদের জোটেনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই মধ্যবিত্ত কি সংগ্রামী ভূমিকা নিয়েছিল তা সুবিদিত। একটি বিশেষ ধরনের আপেক্ষিক সচ্ছলতা এই মধ্যবিত্তের মানসে যদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন এনে দেয়, তা সমস্ত সমাজ ও অর্থনীতির পক্ষেই একটি গুণগত পরিবর্তন সূচিত করবে মনে করলে কি ভুল করা হবে ?

এবার আমাদের বক্তব্যের দুটো পাশকে একত্র করে একটি সমন্বিত বক্তব্য পেশ করতে সমর্থ হব। আমাদের সামনে যে অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা হতাশাজনক ত্রিবিধ কারণে। এক কারণ এই যে আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক তুলনায় যেটুকু প্রগতি আমাদের হবে তার পরিমাণ অতি সামান্য। দ্বিতীয় কারণ এই যে আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক

মানে যাই হোক, সাধারণ এক জনমানসে এই প্রগতি মোটেই অকিঞ্চিৎকর দেখাবে না। তৃতীয় কারণ এই যে ঐতিহাসিক বিচারে নগণ্য কিন্তু জনমানসের সাধারণ বুদ্ধির বিচারে অ-নগণ্য এই প্রগতির হারটা আরও বিশ পঁচিশ বছর অনায়াসেই বজায় থাকবে বলে মনে হয়।

কার্ল মার্কস সামাজিক বিপ্লবকে উৎপাদক শক্তি, উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলরূপ বিস্ফোরণ হিসেবে দেখেছিলেন। বিস্ফোরণটা অবশ্য বোমার বিস্ফোরণের মতো নির্জীব পদার্থের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মাত্র নয়, তাতে সচেতন মানুষ অংশগ্রহণ করে। তাতে মার্কস-এর ছকের কোনো অসুবিধে হয় না, কারণ সচেতন ও শ্রেণীবদ্ধ মানুষ উৎপাদক শক্তিগুলির অন্যতম। শ্রেণীবদ্ধ ও সচেতন শ্রমিকসমাজ কিভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর সঙ্গে দ্বান্দ্বিকতা অর্জন করবে বোঝাতে গিয়ে মার্কস pauperisation-এর থিয়োরির পত্তন করেছিলেন। মার্কস ধারণা করেছিলেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এ-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক জনসাধারণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে উঠবে এবং শেষ পর্যন্ত নিষ্পেষণ যখন অসহ্য হয়ে উঠবে তখন শ্রেণীবদ্ধ শ্রমিকজনতা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দরুণ এই নিষ্পেষণ তাকে ভাঙতে উদ্যত হবে। এইভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উৎপাদক শক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ধনিক ও শ্রমিকদের সংঘর্ষের রূপ নেবে।

কিন্তু মার্কস-এর pauperisation-এর ভবিষ্যদ্দর্শন সত্য প্রমাণিত হয়নি (যদিও, বলাই বাহুল্য তাতে মার্কসবাদ বিজ্ঞান হিসেবে বাতিল হয়ে যায় না)। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অন্তত বিশ শতকের গোড়া থেকে এই প্রবণতা বিদূরিত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে আলাদা আলাদা না করে দেখে যদি সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়াকে একসঙ্গে দেখা যায় তাহলে অবশ্য এই সেদিন পর্যন্ত pauperisation-এর থিয়োরি সত্য প্রমাণিত হয়ে এসেছে। কারণ, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আওতার বাইরে গোটা যে ঔপনিবেশিক জগৎ তাতে জনসাধারণের জীবনমান ক্রমশই অবনত হয়েছে এবং তাদের শোষণের অংশভুক্ত হয়েই উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীও তাদের জীবনমান উন্নত করতে পেরেছে। কিন্তু গত দশ বৎসরের ইতিহাসে দেখছি, ভারতবর্ষের মতো দেশেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই গতির মোড় ফিরিয়ে দেওয়া গেছে। যত স্বল্প হারেই হোক, শ্রমিক সাধারণের জীবনমান অবনত না হয়ে উন্নতই হয়েছে এবং এই স্বল্পহারের প্রগতি আরও বিশ পঁচিশ বছর চালিয়ে নেওয়ার

মতো কিছু গুণগত পরিবর্তন অর্থনীতিতে এসে গেছে। প্রশ্নটা এখানে উঠছে pauperisation-এর দরুণ জনসাধারণের যে বিপ্লবী চেতনার উন্মেষের আশা মার্কস করেছিলেন, pauperisation-এর অনুপস্থিতিতে তা কি-উপায়ে সাধিত হবে? প্রশ্নটিকে মার্কসীয় আলোচনায় প্রায় সময়েই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ফ্রান্স বা ইতালির মতো দেশে pauperisation যে সত্যিই আজও মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি, তা প্রমাণের করুণা-উদ্রেককর চেষ্টা এখনও প্রায়ই দেখা যায়। আমাদের পক্ষে বিতর্কটা এতদিন নিতান্তই সুদূর ছিল, কিন্তু এখন আমাদেরও এ-প্রশ্নের সরাসরি সম্মুখীন হতে হবে।

আমি শুধু এইটুকু বলে শেষ করব যে আন্তর্জাতিক এবং ঐতিহাসিক তুলনায় আমাদের প্রগতির হারটা যে নিতান্তই তুচ্ছ, একথাটা যত বড় সত্যই হোক, তা বিপ্লবের সম্ভাবনা বিচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। যা গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে কয়েক শতাব্দীর ক্রমান্বয় অর্থনৈতিক অবনতির পর আজ দশ বৎসর কংগ্রেসী নয়া জমানার আওতায় ভারতীয় অর্থনীতি আবার গতিশীল হয়ে উঠেছে এবং সে-গতি শুধু কতিপয় বৃহৎ ধনতান্ত্রিকেরই ধনবৃদ্ধি করে নি, তা শ্রমিকজনসাধারণ ও কৃষিজীবীদের মধ্যেও সামান্য হারে হলেও জীবনমানের উন্নতি ঘটাচ্ছে এবং মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে শুধু জীবনমানের উন্নতিই ঘটাচ্ছে না, তার মানসে পরিবর্তন ঘটাতে পারার মতো নানাবিধ সুযোগ সুবিধারও সৃষ্টি করছে।

এই প্রবন্ধটি বিতর্কমূলক। আমরা এ-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আহ্বান করছি—সম্পাদক।

পাহাড়ের ডাক

রাম বসু

[বাড়িটা পাহাড়ের ঠিক ধারেই। কান পাতলে শোনা যায় অবিরাম ঝর্ণার শব্দ আর মাদলের আওয়াজ। চারপাশে বাগান। পর্দা উঠলে দেখা যাবে স্টেজের মাঝখানে শমীক দাঁড়িয়ে প্রৌঢ় আদিবাসী সর্দারের সঙ্গে কথা বলছে। শমীকের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি]

শমীক : তারপর তোমরা ওখানে ওই গাছের তলায়

সর্দার : ওই গাছের নিচেই কবর দিলাম

শমীক : তোমরা সবাই মিলে পাথরের চাঙড়গুলোকে
থরে থরে সাজিয়ে রাখলে
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বর্ষার সন্ধ্যায়

সর্দার : কী বৃষ্টি সেদিন! এতো বৃষ্টি কখনো দেখি নি
ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো
মেঘে মেঘে কুমির-আকাশ। হাওয়া রাগত নেকড়ে।

শমীক : আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, খুব স্পষ্ট; চোখের সামনে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাঁকে।
বিদ্যুতের সাপগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে চোখে মুখে
কুঁদে তোলা পাথুরে মুখটা দৃঢ়, শপথে অটল
পাহাড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর মাথা অনেক উঁচুতে
পায়ের নিচেই মৃত,...মৃত ও শায়িত...

সর্দার : শিকারের মতো, রক্তমাখা, থ্যাতলানো, হিম, কাঠ...
সাহেবের পাকা হাত, ওস্তাদ শিকারী
একবারও নড়ে নি একটুও।
যেন কিছুই হয় নি—এমন সহজ স্বরে তিনি
বলেছিলেন আমাকে :
এখানে পলাশ গাছ পুঁতে দিবি মালী
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে।

শমীক : পঞ্চাশ বছর পরে আমি
সাহেবের প্র-পৌত্র আমি, জিজ্ঞাসা করছি
মালী তুমি কিছু জানো কেন, কেন...
কিছু কি শুনেছো? কোন ঘটনা অথবা...

সর্দার : একটা গুলির শব্দ ছাড়া
কিছুই শুনি নি।

শমীক : এবং চিৎকার?
চিৎকার শোনো নি তুমি?
বাঘিনীর গর্জনের মতো
কখনো শোনো নি? আমি কিন্তু ঠিক শুনতে পাই, ঠিক।

সর্দার : চিৎকার এখনো কানে বাজে ঘুরে ঘুরে আসে।

[বাগানে মায়া। জানলা দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে। মায়া শমীকের স্ত্রী। বাগান থেকেই মায়া শমীককে ডাকছে]

মায়ার কণ্ঠ : কি করছ কি ভেতরে?
বাইরে এসো না!
বিজ্ঞানী-মশাই, শুনছেন, আমি
রৌদ্রে মাতাল হয়েছি।

শমীক : সর্দার, কিছুই জানো না, না?
কিছুই শোনো নি তুমি? তা কি হয়! বলো
আজ বলতে কি দোষ?
অনেক পুরানো কথা।

সর্দার : সে কথা বলতে নেই

শমীক : তবে কিছু জানো...বলো...কোনো দোষ নেই।

সর্দার : পাহাড়ের দেবতা ডাকত।

শমীক : পাহাড়ের দেবতা ডাকত?

সর্দার : ডাকে। দেবতার যাকে ইচ্ছা তাকে ডাকে।
...দিতে হয়।...তাকে দিতে হয়
দেবতার থানে।
ওকে ডেকেছিল।

শমীক : আমার ঠাকমাকে? ডেকেছিল? আমার ঠাকমাকে?

সর্দার : পাহাড়ের দেবতা ডেকেছিল।
সাহেব দেয় নি। দেবতার ধন দেবতা নিজেই
একদিন রাত্রে এসে নিজে নিয়ে গেল।
সাহেবের বিশ্বাস হয় নি,
ভেবেছিল নষ্ট হয়ে গেছে।
তাই পরদিন ভোরে ঝর্ণার ধারেই…

শমীক : একটা গুলির শব্দ।

মায়ার কণ্ঠ : এটা কি পলাশ গাছ? কি অদ্ভুত! ত্থাখো
তুই নৈঃশব্দ্যের মাঝখানে
স্পন্দিত বীজের মতো। ত্থাখো
আমি মুকুলিত হব।

সর্দার : অনেক পুরানো কথা। সকলে জানত
সাহেবের সঙ্গে জঙ্গলে শিকারে গিয়ে…

শমীক : এ কথা আর কে জানে

সর্দার : তারা আজ কেউ নেই

শমীক : শুধু তুমি ছাড়া

সর্দার : শুধু আমি ছাড়া

মায়ার কণ্ঠ : বাইরে, বাইরে এসো
ত্থাখো, আলোয় আলোয়
পৃথিবী রহস্য হয়ে গেছে।

শমীক : তুমি কেন আছ?

[প্রশ্নটা বুঝতে পারল না সর্দার। তাকাল]

তুমি আজো কেন বেঁচে আছ?

সর্দার : আমারও সময় হলো

শমীক : আমি যেন ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয় তোমার…

সর্দার : আমি যাই।

মায়ার কণ্ঠ : কুরচির কোলাহলে আমি হারিয়ে গেলাম।

শমীক : আমার নির্দোষ দিগন্তকে এইভাবে
রক্তে কলুষিত করে তোমার বাঁচার
অধিকার নেই।

মারাত্মক দুঃস্বপ্ন বিছিয়ে
তুমি ভয় দেখাবে আমাকে?
তুমি দিতে চাও নিপুণ হত্যার
উত্তরাধিকার?
মিথ্যা, মিথ্যা, তুমি আদিম মিথ্যার কণ্ঠ।
আমি অস্বীকার করি।
কি প্রমাণ আছে? এই রূপকথা
কে বিশ্বাস করবে? কে বলবে
খুনীর বংশের আমি, এই আমি ডক্টর শমীক রায়?
একটা গুলিতে আমিও তোমাকে
স্তব্ধ করে দিতে পারি,
কিন্তু তা দেবো না, যাও।

[সর্দার চলে গেল। তার হাতে তীর-ধনুক ও মৃতপাখি। স্টেজ অন্ধকার। শমীক একা দাঁড়িয়ে। বাগানে মায়ার কণ্ঠ]

মায়ার কণ্ঠ : আমি কত হাল্কা হয়ে গেছি রোদ্দুরে হাওয়ায়
বাইরে, এখানে এসো মেঘের তলায়।

[শমীক নিরুত্তর। অল্প পরে মায়া এলো। ওদের দুজনকে ঘিরে আলোর দুটি স্বতন্ত্র বৃত্ত]

মায়া : কি হয়েছে তোমার বলতো?
দু-দিন পাথর হয়ে আছ।
কথা নেই, হাসি নেই, কি ব্যাপার বিজ্ঞানী-মশাই?

[শমীক নিরুত্তর। বিরতি]

বিশেষ সংবাদদাতা, খুঁটি, আজ তেসরা এপ্রিল
ডক্টর শমীক রায়, নাম করা বিজ্ঞানী এবং
অল্পাধিক কবি, পিতামহের আবাস দেখতে এসে
মনোভঙ্গে অত্যন্ত কাতর। চিকিৎসকের মতে তাঁর
এই স্থান ত্যাগ করা অবশ্য বিধেয়। অতএব
হে পতি দেবতা দাসী কলকাতার জন্যেই প্রস্তুত।

[শমীক নিরুত্তর। বিরতি]

কিন্তু আমার কী ভালো লাগছে যে! মনে হচ্ছে আমি
ওই ঝর্ণার মতন প্রবাহিত হয়ে গেছি দূরে

সমস্ত আকাশ আলো মেঘ পাখির ডানায় বোনা
সত্তার উজ্জ্বল অংশ এতকাল যা ছিল দুর্জ্ঞেয়
অবারিত হয়ে গেছে আজ, স্বচ্ছতার দীপ্তি লাগে
ভালোবাসার ওপর, এই দেহ মর্মরিত হলো
আমি যেন বলতে পারি : আনন্দিত, আমি আনন্দিত।
স্বামী মহাশয়,
বিষণ্ণ আনন কেন হেরি আপনার ?

[মায়া শমীকের হাত ধরে টানতে গেল। শমীক পিছিয়ে এলো। ওরা দু-জন দুটি আলোর স্বতন্ত্র বৃত্তে]

কথা বলবে না, এই তো ? বয়ে গেছে ! আমি
কথা বলে যাব, আমি কথা হয়ে গেছি।
কোন ভোরে উঠে গেছি ঝর্ণার কিনারে ; মগ্ন পুব
পশ্চিম বিভোর। আমি তার মাঝখানে
স্তব্ধতার বীজ ; আমি স্থির, ঘন-কালো,
এই মাত্র ফেটে পড়ব যেন। সমস্ত স্তব্ধতা
গান হয়ে যাবে।
চারপাশে রামধনুর বলয়, মৃত্যুর উপরে
উর্বরতা। শিকড়, বল্কল, পাতা, সমস্ত জটিল
উপাদান একটা নিমেষে যেন মন্ত্র হয়ে যাবে।
আমি যে এমন ভাবে ভাবতে পারি জানি নি কখনও।

[বিরতি। শমীক নিরুত্তর]

আজকে বাগান অকস্মাৎ চোখের সামনে
ফুল হয়ে গেল। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আমি
আগে কখনও দেখিনি। ফুলের জন্মের লগ্ন আগে
কখনও দেখি নি। ওই যে পাথর ঢিপি হয়ে আছে
ওর পাশে পলাশ গাছটা অকস্মাৎ জ্বলে উঠল
কোমল আগুনে, মনে হলো আমার ভিতর থেকে
সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, আমার সত্তার অংশ।

[শমীক জানলা বন্ধ করে দিল]

ও কী করছ ? খুলে দাও, খুলে দাও,
রোদ্দুরে পৃথিবী ভাসছে, চলো ওই পলাশের নিচে
তুমি বসে পড়াশুনা করবে আমি প্যাটার্ন তুলব।

শমীক : আমার বন্দুক কোথায় রেখেছ মায়া ?

মায়া : কি ব্যাপার ? এমন সকালে শিকারের তৃষ্ণা কেন ?
ওই বুড়োটা নিশ্চয়ই তোমার মাথায়...।
জল ডুমুরের কানে ঝর্ণা অভিভূত কথা বলে
আমাদের কথাগুলো অমন হয় না তো !

শমীক : আমার বন্দুক কোথায় রেখেছ মায়া ?

মায়া : এই ঘরে। এনে দেব ? এখুনি আনছি
কিন্তু মনে থাকে যেন আজকে শিকার চলবে না।

[মায়া পাশের ঘরে গেল। সেই ঘর থেকে বলছে]

মায়া : শুনতে পাচ্ছ তুমি ?

শমীক : কি ?

মায়া : অজস্র পাখির ডাক।

শমীক : কোথায় ?

মায়া : আমাদের বাগানের ধারে।

শমীক : না।

মায়া : সাবধান লাইভ কার্তুজ।

[মায়া বন্দুক ও কার্তুজ হাতে দিল]

কি চমৎকার বেদী ওই গাছের তলায়
কি নরম মসৃণ গভীর শ্যাওলা দিয়ে মোড়া
আমি আজ রাত্রে ওইখানে শুয়ে থাকব
আমার ভিতর থেকে চাঁদ উঠে আকাশে দাঁড়াবে।

শমীক : মায়া

মায়া : কি ? এমন করছ কেন ? কি হয়েছে ? বলো।

শমীক : কিছু না তো ! এমনি। কিছু না। মায়া, অন্য কথা বলো
খুব ভালো লাগছে তোমার ? মায়া...

মায়া : আপসোস হয়...

শমীক : কেন ?

মায়া : আগে অতিরিক্ত, অবাঞ্ছিত, মনে হতো।
বিরক্তি ক্লান্তিতে ডুবে থাকতাম।
এখানে আসার পর মনে হচ্ছে
এই গাছ-গাছালি ও পাখি-পাখালির মতো
আমিও এদের একজন।
আমিও এদের অংশ এদের আত্মীয়।
আমি আবিষ্কৃত হয়ে গেছি যেন।

শমীক : ও কথা ভেব না মায়া। ওই সব
কাঁচা রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাস আমার···
আমার অসহ্য লাগে।

[মায়া আহত। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। চা নিয়ে বেয়ারা এলো। মায়া চুপ করে চা তৈরি করছে]

আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।
আজকেই প্রবন্ধটা শেষ করে দেবো।

মায়া : কোনটা ? টাইম অ্যাণ্ড স্পেস ?

শমীক : নো স্পেস। সবটা সময়। সময় শুধু···স্পাইর‍্যাল···
ঘুরে ঘুরে আসে এক তীব্র শান্ত উজ্জ্বল বিন্দুতে।

[মায়া চা করছে। একটা প্রজাপতি ঘুরছে ওদের মাথার ওপর। শমীক প্রজাপতিটাকে ধরতে চেষ্টা করছে]

মায়া : এই বোকা···পালা···মারা পড়বি···যা, যা···পালা, পালা প্রজাপতি
আমি গাছ নই ; বোকা। হ্যাঁ, ওদিকে যা। তোমার চান্স আছে
ধরো না, ধরো না। পালা। বেঁচে গেলি। ফলিত বিজ্ঞানী, তোর
কোনো দাম নেই ওর কাছে। ধরো না, ধরো না, পায়ে পড়ি
ছেড়ে দাও, ছাড়ো, ছাড়বে না ? আমিও ঠিক উঠে যাব।

শমীক : ঢাকনিটা দাও

মায়া : কেন ?

শমীক : দাও।

[শমীক ঢাকনি দিয়ে প্রজাপতিকে চাপা দিল। মায়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল]

মায়া : রাত্রে তুমি অঘোরে ঘুমিয়ে। ঘুম আসে নি আমার।
আমি ওই পাহাড়ের দিকে চেয়ে ছিলাম। আমার

চোখ দুটো আটকে গিয়েছিল। শেষ রাতে ঘুম এলো
আর পাহাড় ডাকল।

শমীক : মায়া···মায়া

মায়া : কি ? কি ?···সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন ! পাহাড় ডাকল !
চারপাশে পাথরের পবিত্র স্তব্ধতা, জঙ্গলের গন্ধ।
আর এক প্রাচীন গানের কলি···একটানা সুর
শেষ রাতে মাটি আর অরণ্যের বন্দনা বিনত
আমি চলছি তো চলছিই। অজ্ঞাত শক্তির টানে আনন্দিত।
জলন্ত মশাল গাছ, ঝর্ণায় মাদল, দলবদ্ধ
ছায়া আমার পিছনে। মৃতদের কণ্ঠে পাখি, আলো।
পৃথিবীর রক্ত খুন প্রেম ও প্রতিভা ছড়িয়ে রয়েছে।
শেষকালে একজন করোটিকে বর্শা বিদ্ধ করে
বলে উঠল : থামতে হলো। সহসা লুটিয়ে পড়লাম।
তুমি ও বন্দুক নিয়ে কি করছ ? রাখো তো। ভয় লাগে।
আজ আমি রক্তপাত সইতে পারব না। না। রাখো।

শমীক : আজকে কলকাতা যাব।

মায়া : আজকে যাব না।
আজকেও দেখব যদি
পাহাড় আবার ডাকে।

শমীক : আজকেই যাবে।

মায়া : এত রূঢ় স্বরে কথা বলছ কেন
কি হয়েছে তোমার বল তো ?

শমীক : তুমি আজ যাবে।

মায়া : অদ্ভুত !

শমীক : তোমার মুখটা ঠিক ঠাকমার মতো, অবিকল।

মায়া : তাই বুঝি ? তুমি তাঁকে কখনো দেখেছো নাকি ?

শমীক : মনে হচ্ছে তোমার গলার স্বর ঠাকমার মতো।
আজকেই যাব। এখানে থাকব না। কক্ষনো না।

মায়া : আজ থাক। না। না। কাল যাব। আজকে পাহাড় ডাকিবে।

[কিছুক্ষণ স্তব্ধতা]

শমীক : শুনতে পাচ্ছ ?
মায়া : কি ?
শমীক : ব্যর্থ পাথার ঝাপট।
মায়া : বাইরে আমার জন্য।
প্রজাপতি আলো সোহাগিনী।
শমীক : এতক্ষণে মরিয়া হয়েছে।
মায়া : ছেড়ে দাও
শমীক : আর্তনাদ করছে এখন।
মায়া : ছেড়ে দাও
শমীক : আমার আনন্দ লাগছে। পেশিতে পেশিতে জোর পাচ্ছি।
মায়া : ওকে বাঁচতে দাও।
শমীক : একটু গরম জল দাও। দেবে না ? নিজেই নেব।
মায়া : কি হয়েছে তোমার আজকে ?
শমীক : আমার রক্তের মন্ত্র আমি আজ শুনতে পেয়েছি।
মৃত, দক্ষ প্রজাপতি, তুমি মৃত, মৃত, মৃত, মৃত।
মায়া : তুমি কি নিষ্ঠুর !
শমীক : আমার রক্তের মন্ত্র আমি আজ শুনতে পেয়েছি।
মায়া : আমার আনন্দ তুমি এইভাবে হত্যা করবে নাকি ?
শমীক : আমি জোর পাচ্ছি।
নৃশংসতা, অকারণ নৃশংসতা। রক্তের ভিতরে
কী আশ্চর্য গুঞ্জন উঠেছে।
মায়া : তুমি কি করে পারলে ?
শমীক : আশাহীন আনন্দের জোরে
অর্থহীন উদ্দীপ্ত ভাবনায়।
মায়া : তুমি কি নিষ্ঠুর !
শমীক : নিষ্ঠুরতা জীবনের পরতে পরতে।
মায়া : এত নৃশংসতা তুমি কি করে লুকিয়ে রাখো ?
কোন ভদ্রতার জটিল মুখোশে ?
আমাকেও একদিন তুমি···
শমীক : মায়া।

মায়া : আমার আশ্চর্য লগ্ন তুমি কলুষিত করে দিলে
আমার সূর্যের গলা টিপে তুমি অন্ধকার দিলে
তুমি যে কোনো সময় খুনী হতে পারো, কি জঘন্য।
শমীক : দিগন্ত ক্রমশ স্পষ্ট।
আমি খুনী হতে পারি···। হাসি পায়। প্রাণ নিতে পারি
যেহেতু আমরা প্রাণ দিতে পারি। মৃত্যু কিছু নয়।
মায়া : ঘরটাকে গুহা বলে মনে হয়
শমীক : মায়া
মায়া : কথা বলতেও ঘৃণা করে।
শমীক : ঘৃণা ?
মায়া : ঘৃণা···এই মুহূর্তেই আমি ঘৃণা করলাম তোমাকে
শমীক : মায়া
মায়া : না

[মায়া বাগানে চলে গেল। বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়াল শমীক]

শমীক : মায়া সরে যাও···সরো।
মায়ার কণ্ঠ : আমার জগতটাকে রক্তে রক্তে নোংরা করে দিলে
তোমাদের প্রতিভা ঘৃণায় এই গ্রহ নিভে যাবে বুঝি
পৃথিবী ভিখারী বুড়ি অন্তিম দিনের প্রতীক্ষায়
তোমাকে এমন ভাবে আমি দেখতে কখনও চাই নি।
শমীক : মায়া।

[হাত থেকে বন্দুক খসে গেছে। স্টেজ অন্ধকার। বিরতি। কিছু সময় পার হয়ে গেছে। টেবিলে মাথা রেখে শমীক ঘুমিয়ে পড়ছে। তার এক হাত ছোট দূরবীনের ওপর, অন্য হাত বন্দুকের ওপর। শমীক স্বপ্ন দেখছে। ছায়া পড়ছে। দরজায় শব্দ]

শমীক : কে ?
ছায়া : দরজা খোলো।
শমীক : না।
ছায়া : তবে কাছে এসো
শমীক : কেন ?

ছায়া : তোমাকে দেখি নি। দেখি…
কচিদের মুখের দুধের গন্ধ বড় ভালো লাগে।
শমীক : আমি খুব বড় হয়ে গেছি
ছায়া : তাই বুঝি? তাই অকারণ।
শমীক : কে তুমি? কে?
ছায়া : তোমাদের আরম্ভ হয় নি।
শমীক : দেখছ না, পৃথিবী রহস্য নয়। অঙ্কের নিয়ম
এখন সমস্ত গ্রহ আমাদের মুঠোর ভিতর।
ছায়া : তবু কত অনিশ্চিত। স্থির হতে গিয়ে
ভীষণ অস্থির। প্রেম চেয়ে
ঘৃণার পূজারী।
শমীক : তোমার গলার স্বর অমন গম্ভীর লাগে কেন?
ছায়া : নদী শস্য কুয়াশায় পূর্ণ হয়ে গেছি।
শমীক : আমি ভীষণ অপূর্ণ।
তোমার গলার স্বর বড় পরিচিত।
ছায়া : আমাদের এক উৎস, কিন্তু ভিন্ন শাখা।
শমীক : মানে?
ছায়া : একটি জীবন, প্রবহমানতা; শুধু পৃথক আধার।
শমীক : কে, তুমি কে?
ছায়া : ধুলো, ধুলোর ফুলকি।
শমীক : যুক্তিহীন কথা। শব্দের বিভ্রান্তি, ভুল।
আগুনের ফুলকি হয়। তোমার মুখটা ঠিক মায়ার মতন।
মনে হলো তুমি বুঝি মায়া।
ছায়া : আমাকে আসতে দাও আজকে বিয়ের দিন।
শমীক : তবে তুমি সেই
ছায়া : আমি সেই।
শমীক : তোমার মুখটা ঠিক মায়ার মতন।
কি করে তোমার মুখ মায়ার মতন হলো? কেন?
হতে পারে। হতে পারে। বিস্ময়ের কিছু নেই এতে।
ছায়া : তুমি ওকে গুলি করতে গেলে?

শমীক : পাহাড়ের ডাক শুনে আমার…আমার…
ছায়া : আমার মতন চলে গিয়েছিল। তাই?
শমীক : তুমি কেন গিয়েছিলে?
ছায়া : সত্যিই পাহাড় ডাকত। দূর গ্রহ আলো ফেলে ফেলে
নিয়ে যেত, তরঙ্গের বিশুদ্ধ ভাষায় মন্ত্রমুগ্ধ,
সঙ্গীতের শয্যা পাতা পাথরে পাথরে, মনে হতো
শরীর সংকেতবহ, বাতিঘর, তাই মূল্যবান
দৃশ্য অদৃশ্যের আমি সেতুপথ। তা ছাড়া তুচ্ছই।
কতদিন নিজেকে বিছিয়ে দিয়ে পাহাড়ের নিচে
পৃথিবীর অন্ধকার উর্বরতা হয়ে গেছি আমি
পরিপূর্ণ দিঘির মতন টলমল করেছি জ্যোৎস্নায়।
শমীক : কেন আমি এমন অপূর্ণ?
মায়া মাঝে মাঝে ঝর্ণা হয়ে যায়
প্রতিবেশে যথাযথ, একাত্মক, অনিবার্য, সুর
আমি তা পারি না।
ও-ডাকে যখন আমি সাড়া দিতে চাই
কিন্তু সব উচ্চারণ আর্তনাদ হয়ে ওঠে যেন,
আমি গুলি করি নি মায়াকে
আমি তার আনন্দকে নিহত করেছি
আমি খুনী, খুনী, খুনী।
ছায়া : কি তোমার হাতে?
শমীক : দূরবীন, রাইফেল।
ছায়া : পায়ের তলায়?
শমীক : পৃথিবী, অস্থির গ্রহ।
ছায়া : তুমি নিজে?
শমীক : বিবর্ণ, পীড়িত।
ছায়া : আর মায়া।
শমীক : আনন্দিত। আমি তার আনন্দকে নিহত করেছি
আমাদের মাঝখানে রক্তের নদীর ব্যবধান।
[ছায়া হাসছে। ঝর্ণা ও মাদলের স্বর স্পষ্টতর]

আমার এ ঘর গুহা হয়ে গেছে

[ছায়া হাসছে]

অসহ্য, অসহ্য, হাসি। তুমি এত ক্রূর হতে পারো ?
আমি গুলি করতেও অক্ষম।

[ছায়া হাসছে]

আর ছিন্ন করো না আমাকে
আমি এক অনির্ণেয় হাহাকার
ঐক্যে গাঁথা কখন হব না ?
দুটি বিরুদ্ধ জগত কখনও মিলবে না ?

[ছায়া হাসছে]

অন্তর বাহির হোক
বাহির অন্তর।

ছায়া : আসীনো দূরং ব্রজতি
শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং সদাসদং দেবং
সদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি।

[ছায়া মিলিয়ে গেল]

শমীক : মায়া, মায়া, কেউ নেই ?
আমার ডাকের সাড়া দিতে
কেউ নেই আমি কি নির্জন পড়ো বাড়ি !

[শমীক উঠে দাঁড়াল আর পর্দা নেমে এলো। মাদল ও ঝর্ণার শব্দ বিপুল ভাবে ধ্বনিত হচ্ছে ॥

প্রত্যক্ষ

সমরেশ বসু

আমার সেই সহৃদয় বন্ধুটি তাঁর রোজনামচা আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আরো বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এই জন্যে যে, বন্ধুবর তাঁর রোজনামচা থেকে, যে-কোনো অংশ, আমার নিজের ভাষায় লিখে প্রকাশ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, নাম ধাম পরিচয় গোপন রাখার শর্ত ছিলই। আমি সে শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

আর এই অনুমতি দেবার সাহস যাঁর আছে, তাঁর সম্পর্কে দু-একটি কথা আমাকে আগেই বলে নিতে হবে। যদিও তিনি, যাঁকে বলা যায় 'এলিটস্ অব দি সোসাইটি' ; তবু সেই জাতের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে পড়েন না, যাঁরা সত্যি-মিথ্যের ধার ধারেন না। প্রথানুযায়ী পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয়, তিনি সদ্বংশজাত, অভিজাত, সম্ভ্রান্ত, অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে, ইত্যাদি। সে সবের বিস্তৃত বর্ণনা আমি দিতে চাইনে। আমি বিশেষভাবে এইটুকু বলতে চাই, তিনি বিদ্বান। প্রকৃত গুণীজন বলতে আমরা যা বুঝি, তিনি তাই। তিনি তাঁর আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত, শ্রদ্ধাবান। মিথ্যা কথা কখনো বলেন না। এ যুগে কথাটা অবিশ্বাস্য শোনালেও, স্বীকার করতেই হবে, কখনো কোনো পাপ করেন নি। মিত্র-বন্ধুদের অন্যায় আঘাত করেন নি। এবং সব বিষয়ে অতিরিক্ত সচেতনতার দরুনই বোধহয় বন্ধুটিকে খুব নিরীহ আর কোমল বলে মনে হয়। অবিশ্যি তাই, কিন্তু এত কথা জানবারও কোনো দরকার হয়তো নেই।

তবে রোজনামচাটা পড়তে দেবার আগে তিনি বলেছিলেন, "ঘটনা বাদ দিয়ে, আমার উক্তিগুলোকে বরাবরের বিশ্বাস বলে ধরে নিও না। যেমন ধরো, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দশ বছর আগে আমি যে কথা রোজনামচায় লিখেছি, আজকে আর সে রকম চিন্তা করি নে। ও সবই সাময়িক। আর তোমাকে যে প্রকাশ করবার অনুমতি দিচ্ছি, তা এই ভেবে যে, আমার বিশ্বাস, কোনো

কোনো ঘটনায়, দশজনকে জানাবার মতো একটা অর্থময় বিষয়বস্তু আছে। অবিশ্যি আমার চোখ দিয়ে দেখলে।"

রোজনামচাটা আমার হাতে নেই। তাই আমার স্মৃতি থেকেই, অনেক দিন আগের এক সন্ধ্যারাত্রের একটি ঘটনা আমি প্রায় হুবহু তুলে দিচ্ছি।

"২৩শে ফেব্রুয়ারি, সন্ধ্যাবেলা,···সাল॥···রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা॥

"বাড়িতে আজ একটা ছোটখাটো উৎসব চলছে। এর আগের বছরও, এ সময়েই, ঠিক এরকম উৎসবই হয়েছিল। আমার এম. এ. পাশের খবর বেরিয়েছিল। আজ আমার বোনের বেরিয়েছে। আমি ইংরেজিতে, ও বাংলায়। উৎসব বলতে, বোনের দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবী, কাছাকাছি আত্মীয়-স্বজন, সবাই মিলে একটা পারিবারিক সংবর্ধনা বলা যায়। বাড়ির দোরগোড়ায় ভজন খানেক গাড়ি পার্ক করে রয়েছে। রেডিওগ্রামে রেকর্ডের পর রেকর্ড বেজে চলেছে। আর আমি ছাদে এসে দাঁড়িয়ে আছি। উৎসবে আমি যোগ দিতে পারছি নে। যোগ দেবার মতো মানসিক অবস্থা আমার নয়। আজ আমার বুকের মধ্যে একটা আশ্চর্য থরথরানি। একটি বিশেষ উত্তেজনায়, আনন্দে এবং বিচিত্র ভয়ের শিহরণে থর থর করে কাঁপছে বুকের মধ্যে। যদিও আমি শান্ত থাকবার চেষ্টা করছি, তবু বুঝতে পারছি, নিজেকে আমি ঠিক স্বাভাবিক রাখতে পারছি নে। কারণ, আজ আমার সেইদিন··· সেই চির ইপ্সিত মুহূর্ত এসেছে। আর একটু পরেই আমি···। না, এ ভাবে অস্থির হয়ে ওঠা আমার উচিত হচ্ছে না বুঝতে পারছি। এ সময়েই আমার সব থেকে বেশি শান্ত, স্বাভাবিক অথচ প্রতি রন্ধ্রে তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারা উচিত। তা হচ্ছে না বলেই, বারে বারে আমাকে ছাদে পালিয়ে আসতে হচ্ছে।

"সত্যি কথা বলতে কি, বছর দুয়েক আগে লীনাকে প্রথম যেদিন আমি আদর করেছিলাম, যার দেহ সৌষ্ঠব ভেনাস-এর মতোই মনে হয় আমার··· আর সেই রক্তাধর···আয়ত কালো চোখ···যাকগে, যা বলছিলাম, সেই প্রথম দিন আমার এই রকমই একটা অনুভূতি হয়েছিল। অথচ কত তফাৎ! সেটার মধ্যে ছিল একটা সংকীর্ণ আত্মসুখের উন্মাদনা, দুটি প্রাণের গাঁজিয়ে ওঠা রসের পাত্রে মদ-গন্ধ। আর এটা···আজকের এই উত্তেজনা, আনন্দ, ভয়ের মধ্যে আছে একটা মহত্ত্ব, এক মহান কর্তব্যের জীবন-তুচ্ছ-করা আহ্বান,

যেখানে পুড়তে মরতে, সব কিছুতেই একটা ব্যাকুল শিহরণ আমি অনুভব করছি। যা আমার জীবনে আর সব কিছুই তুচ্ছ করে দিয়েছে। এই যে পড়াশুনো, পরীক্ষা পাশ আর তার আনন্দ, এ সবই খুব অর্থহীন মূল্যহীন বলে মনে হয় আমার। এ সবের আর কোনো দাম নেই আমার কাছে। যেখানে মাটি নেই, সেখানে দাঁড়াবার যেমন কোনো প্রশ্ন নেই, সেই রকম। আসল কাজই বাকি, কী হবে আমার লেখাপড়া পাণ্ডিত্যে, আর ব্যক্তি জীবনের সার্থকতায়।

"হাত তুলে ঘড়িটা চোখের সামনে নিয়ে দেখলাম। সোয়া সাতটা। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদেই বাড়ি থেকে বেরোবার কথা আছে আমার। তারপর ট্রামে চেপে, মধ্য কলকাতার সেই নির্দিষ্ট বড় বিল্ডিংটার সামনে, পশ্চিমের ফুটপাতে, গাছের পাশে লাইটপোস্টের তলায় আমাকে উপস্থিত হতে হবে। সেখানে আমার জন্যে একজন অপেক্ষা করবে। কিংবা আমাকেও দু-চার মিনিট অপেক্ষা করতে হতে পারে। যে-আসবে, সে আমার চেনা নাও হতে পারে, কিন্তু আমি তার চেনা। সে নিজেই আমার কাছে এসে দাঁড়াবে, আমাকে অনুসরণ করতে বলবে, আর তারপরেই আমি···

"নাঃ, এ পঁয়তাল্লিশ মিনিট যেন অক্ষয়। এর শেষ নেই। আর একটু আগেই টের পেয়েছি, লীনা এসেছে। ও আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। মা ওকে খুব পছন্দ করেন, ভালোবাসেন এবং একটা চাপা ইচ্ছেও বোধহয় আছে যে, পুত্রবধূ করেন। লীনারা রুচিসম্পন্ন বড়লোক, আজকাল যাদের আমি "তথাকথিত বড়মানুষ" বলে থাকি। লীনাদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের বাড়িরও যোগাযোগ আছে। লীনা এখন নিশ্চয়ই মায়ের সঙ্গে আমার বিষয়েই আলোচনা করছে। মা হয়তো কাঁদছেন আমার কথা বলতে বলতে। আমি ভয় পাচ্ছি, লীনাকে মা হয়তো ছাদে পাঠিয়ে দেবেন। কেন না, মা-ই একমাত্র আমাকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করেন। তিনিই একমাত্র জানেন, আমি ছাদে আছি। আর লীনা হয়তো করুণ মুখ করে আমার কাছে আসবে। তার চোখে থাকবে বিস্ময় এবং বিষণ্ণতা। যেন ভিন্ন জগতের কোনো মানুষের ট্র্যাজেডি ওর চোখে ভেসে ওঠে। হয়তো বসবে পাশে, হাত ধরবে, বলবে, "একটা গান করব অশোক।" যেন আমি মৃত্যু শয্যায় পড়ে আছি, তাই আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া। আর, আমি প্রত্যাখান করতে পারব না। এবং আমি যা-ই বলি না কেন, একথা মানতে হবে,

লীনার গলায় একটা দুরন্ত জাদু আছে। সে হয়তো গাইবে, "যে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে" কিংবা, "রূপে তোমায় ভোলাব না।"

"সেই আশ্চর্য সুর, ভাষা এবং লীনার কণ্ঠস্বর, সব মিলিয়ে গণ্ডুষে গণ্ডুষে তীব্র মদের মতো আমাকে একেবারে নেশাচ্ছন্ন করে ফেলে। আমি কথা বলতে পারি না, কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। একটা স্বপ্নের মধ্যে যেন আমি তলিয়ে যেতে থাকি। এই সব গানকে আমি 'রবিঠাকুর-ব্র্যাণ্ড মদ' নাম দিয়েছি। এ সব আমার জন্যে নয়, আমাদের জন্যে নয়, আমরা যারা অন্য এক জগতের স্বপ্ন দেখছি। যুধাজিৎ-এর চিঠির ভাষা আমার মনে পড়ছে। যে-চিঠি এখন আমার পকেটেই রয়েছে। আমাকে লেখা চিঠি।··· "কলকাতার উপকণ্ঠের শ্রমিকদের গুপ্ত সভায় সেদিন আপনি যে-সব কথা বলেছেন, তা সত্যি উদ্দীপনাময়, দুঃসাহসিক এবং গভীর চিন্তাপ্রসূত। আমি বুঝতে পারছি, ছাত্র নেতৃত্ব থেকে, শ্রমিক আন্দোলনেই আপনার যোগ্যতা অনেক বেশি। আর বিপ্লব সৃষ্টি করতে, জনসাধারণের এই অংশই সব থেকে আগুয়ান। বিপ্লবী সংস্থা থেকে আমাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার। তাই আপনাকে আমি আমন্ত্রণ করছি···।···নির্দিষ্ট জায়গায় একজন শ্রমিক আপনার জন্যে অপেক্ষা করবেন···।"

"যুধাজিৎ আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন। গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার নেতা, আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাঁর বাস। যাঁর নামে পুলিশের পরোয়ানা ও পুরস্কার ঘোষিত। যাঁকে চোখে দেখতে পাওয়া, সান্নিধ্য এবং আলোচনা করতে পাওয়া এক পরম সৌভাগ্য। আমাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু আঃ! এখনো পনের মিনিট বাকি।···বাতাস নেই একটুও। এখনো একটু শীত রয়েছে। কলকাতার এ-দক্ষিণাঞ্চলেও ধোঁয়া জমাট। সব অস্পষ্ট, আবছা। আশেপাশের বাড়িগুলোর অবয়ব ভুতুরে হয়ে উঠেছে। যা দু-একটা নিষ্পত্র গাছ দেখা যায়, সেগুলোকে কুৎসিত কুটিল অজস্র নগ্ন-থাবা-জানোয়ারের মতো দেখাচ্ছে। নিচে একটা দ্রুত তালের বাজনা বাজছে রেকর্ডে।

"আমাকে নিচে নেমে পেছনের দরজা দিয়ে চুপিচুপি যেতে হবে। যাতে কেউ দেখতে না পায়। কৈফিয়ৎ তো নানারকম আছেই। তা ছাড়া, দাদারা, বোনেরা, বাবা, মা, কেউ-ই শ্রমিক আন্দোলন, বিপ্লবী সংস্থাকে ভালো চোখে দেখে না। কারণ অবিশ্যি তাদের অজ্ঞতা। এসব বিষয়

সম্পর্কে সম্যক বোধই তাদের নেই। আমাদের পরিবারকে রুচিবান অভিজাত বলা হয়। কিন্তু জানে না, তাদের সমগ্র জীবনটাই ফাঁকি ও মেকি। আমাকে নিয়ে সকলে ভয় পায়, অবাক হয়। যেন আমি দেবকুলে অসুর এই পরিবারে। যেন আমি কোনো নিষিদ্ধ অপরাধীদের দলে মিশেছি।

"ট্রাম থেকে নেমে আমি হাঁটতে লাগলাম। এ রাস্তাটার দু-পাশে বড় বড় হোটেল আর বার। ফুটপাথের ধারে ধারে সারিবদ্ধ গাড়ি। বাড়িগুলোর ভেতর থেকে মাঝে মাঝে গান এবং বাজনার শব্দ ভেসে আসছে। আর মেয়ে-পুরুষেরা পশুর মতো আনন্দমুখর, হাতে হাত কিংবা আলিঙ্গনাবদ্ধ। এরা এদের ভবিষ্যৎ জানে না।

"এর পরে আর একটা রাস্তায় ঢোকবার আগে, একটা বিশেষ অনুভূতি দিয়ে আমি অনুভব করতে চাইলাম, কেউ আমাকে অনুসরণ করছে কি না। সামনে পেছনে, আশে পাশে, তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে আমি সবাইকে দেখলাম, কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে কি না। আমাকে যথেষ্ট ভালো পোষাকে আসতে বলা হয়েছে এবং আমি তাই এসেছি।···আমি অগ্রসর হতে লাগলাম এবং ক্রমেই সেই বড় বিল্ডিং আমার নিকটবর্তী হলো। আমার বুকের মধ্যে অসম্ভব দ্রুত তালে, জোরে জোরে শব্দ হতে লাগল। পশ্চিমের ফুটপাতেই আমি চলেছি। ওই দেখা যায় সেই গাছ আর গাছের সামনে লাইটপোস্ট। আমার দৃষ্টি পর্যন্ত ঝাপসা হয়ে গেল যেন। পদক্ষেপ এলোমেলো। কেউ কি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে?

"না, কেউ নেই। লাইটপোস্টটা একলাই দাঁড়িয়ে আছে। আমার চোখে সেই চিঠির লেখা ভেসে উঠল, "একজন শ্রমিক আপনার জন্যে অপেক্ষা করবেন। আপনাকে সে চেনে, আপনি একটু লক্ষ্য করলেই তাকে চিনতে পারেন, যদিও শহরতলীর শ্রমিক প্রতিনিধিদের গুপ্ত সভার ভিড়ে আপনি তাঁকে দেখেছেন।"

"কিন্তু আমার দাঁড়ানো উচিত কি না, বুঝতে পারছি না। দাঁড়ানোটাই বরং সন্দেহজনক। আচ্ছা, আমি যদি পায়চারি করি, এবং মাঝে মাঝে পোস্টের পাশে দাঁড়াই, কেমন হয়? আমি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তুলে, তাই করলাম। দু-বার পায়চারি করে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই হঠাৎ একটি মুখের

ওপর আমার দৃষ্টি আটকে গেল। আমি থমকে গেলাম। উল্টো দিকের ফুটপাতের ওপরে, ও-মুখ আমার দিকেই ফেরানো। দৃষ্টি আমার দিকেই নিবদ্ধ। কোঁচকানো চোখের সেই দৃষ্টিতেও একটা তীব্র অনুসন্ধিৎসা। আর যেন একটা জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে, "আমাকেই খুঁজছেন নাকি?" অবিশ্যি ভঙ্গিটা যেন কী রকম লাগছে। আমি তাড়াতাড়ি তার আপাদমস্তক দেখলাম। একটা খাটো প্যাণ্ট এবং ঢলঢলে ছেঁড়া কোট তার গায়ে। উসকো খুসকো চুল। দুঃস্থ দরিদ্র শ্রমিকের মতোই। পরমুহূর্তেই সে নিঃশব্দে হেসে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো, এ মুখ যেন আমার চেনা। আমার মন বলল, এই-ই সে।

"ভাবতে না ভাবতেই, আমাকে প্রায় নিঃসন্দেহ করে, রাস্তা পার হয়ে সে আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কোটরাবদ্ধ চোখ যেন তার জলছে। কিন্তু মুখে হাসি। সঙ্কোচ, সংশয় এবং জিজ্ঞাসু হাসি। যেন, যদি সে ঠিক লোক চিনতে ব্যর্থ হয়, সেই মুহূর্তেই আমাকে এড়িয়ে যেতে পারে। সে একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি আর কিছুতেই নিজেকে চেপে রাখতে পারলাম না। আমার সামনে একজন শ্রমিক আর সে বিপ্লবী সংস্থার সভ্য। আমি বলে ফেললাম, "আপ…আপ হমকো…।"

"সে মাথা নেড়ে বলল, "জী! জী হাঁ, আইয়ে মেরা সাথ।"

"বলেই সে পেছন ফিরে চলতে লাগল। আমি নির্দ্বিধায় তাকে অনুসরণ করলাম। আমি দেখলাম, তার কালো পুরনো ঢলঢলে কোটের পেছনে ছেঁড়া। খাটো প্যাণ্ট-এর নিচে তার ধূলিকালো থ্যাবড়া পা। যদিও মুখ দেখতে পাচ্ছি না, তবু সেই চোয়াল উঁচনো শুষ্কতা, আর জলজলে চোখ আমার সামনে ভেসে উঠল। একজন শ্রমিক। আমার বন্ধু। আমার মনটা আবেগে, ব্যথায় এবং এক ধরণের গর্বে ভরে উঠল। আর গর্কির লেখা শ্রমিক চরিত্রদের কথা আমার মনে পড়ল। ঠিক যেন সেই রকমই, বিশ্বের সর্বত্রই এরা এক।

"আমি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে, তার পাশে পাশে চললাম। হিন্দীতেই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন?"

"সে বলল, "তা হ্যাঁ, আপনার মুখ তো চেনাই। এর আগে দেখেছি।"

"আমি বললাম, "আমারও তাই মনে হলো, আপনাকে আমি দেখেছি।

আপনার নাম বলতে কি কোনো বাধা আছে? মানে, কী নামে আপনাকে ডাকব?"

" "রুস্তম। রুস্তম আমার নাম সাব।"

"সাব? একজন শ্রমিক বন্ধু আমাকে সাব বলছে? আমার এই কেতাদুরস্ত সাহেবী পোষাকের জন্যে নাকি? ছি ছি! কিন্তু আমার কি কিছু বলা উচিত? বোধহয় না। হয় তো, বন্ধু রুস্তমকে সে রকম নির্দেশই দেওয়া আছে। কেন না, দেখছি, সে বেশ স্বাভাবিকভাবেই চুপচাপ চলেছে। মাঝে মাঝে আশে পাশে লক্ষ্য করছে তীক্ষ্ণ চোখে। একটা বিশেষ গাম্ভীর্যও আমি লক্ষ্য করছি তার।

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি অনেকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন?"

"রুস্তম বলল, "তা বহুক্ষণ। তবে বোঝেন তো, বে-আইনী ব্যাপার, আর পুলিশ যদি দেখতে পায়—"

" "নিশ্চয় নিশ্চয়।"

"রুস্তম একটা খুব খারাপ খিস্তি করে বলল, "মেলাই টিকটিকি ছড়িয়ে আছে।"

"খিস্তিটা শুনে আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। কিন্তু সেটা আমার অভ্যাসেরই দোষ। শ্রমিকরা এ-রকম বলেই থাকে। তাদের মুখেই মানায়। আর সত্যি, প্রায় নির্দোষ বলেই মনে হয়। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "সেই জায়গাটা কত দূর? মানে, আমরা যেখানে যাচ্ছি।"

"রুস্তম বলল, "কাছেই, খুব বেশি দূরে নয়।"

"যতদূর মনে পড়ছে, বাড়িটার নম্বর বোধহয় উনিশ, না?"

"রুস্তম মাথা নেড়ে বলল, "হাঁ, উনিশ নম্বরে আছে, তবে আমরা একুশ নম্বরে যাব।"

" "কেন? একুশ নম্বরেই বুঝি…?"

" "সে আপনি গেলেই বুঝতে পারবেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। ওসব আমাকে বলতে হবে না, ঠিক জায়গাতেই আপনাকে নিয়ে যাব।"

"আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "নিশ্চয়! আমি জানি, আপনি ঠিক জায়গাতেই নিয়ে যাবেন।"

"আমি তাকালাম রুস্তমের দিকে। মনে হলো, সে সারাদিন খায় নি। তার

পিঠটা যেন কুঁজো হয়ে গিয়েছে। তবু কর্তব্যে কি অবিচল। যেন একটা কঠিন শপথ তার গালের ভাঁজে, চোখের দৃষ্টিতে। তবু কি রকম মায়া হলো আমার। কষ্ট হলো! আমি আবার না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, "এ পথে মানে এই কাজে আপনি কতদিন নেমেছেন?"

"রুস্তম বলল, "অনেকদিন। প্রায় দশ বছর।"

" "তার আগে?"

"রুস্তম আবার ভয়ঙ্কর একটা খারাপ কথা বলল। কিন্তু আমার অনভ্যস্ত কানকে আমি মন দিয়ে শাসন করলাম। খারাপ কথাটা বলে সে জানাল, "ওই শালা চামড়ার কলে কিছুদিন কাজ করেছিলাম। তারপরে কিছুদিন ঘোড়ার গাড়ি চালিয়েছিলাম। তা—"

"আবার একটা খুব খারাপ কথা বলল সে। বলবেই! আমি তো তাকে এখুনি শুধরে দিতে পারব না। বলল, "দিনকাল তো দেখছেন। শালার ঘোড়াটা গেল মরে। দানাপানি পেত না তো। আর যারা গাড়ি চাপে, বানচোতেরা ভাড়া কিছুতেই বেশি দিতে চায় না।…তবু, ইব্রাহিম চাচার একটা বাড়তি গাড়ি কিছুদিন চালিয়েছিলাম, তা—"

"আমার কানে তীরের মতো এসে আর একটা খারাপ কথা বিঁধল। "পরের গাড়ি চালিয়ে মজুরি পোষাত না। তারপরে…অবিশ্যি, এ লাইনে আমার ঝোঁক ছিল। তারপরে পুরাপুরি চলে এলাম।"

"আমি বললাম, "ঠিক করেছেন।"

"সত্যি, রুস্তমের মতো একজন চেতনাসম্পন্ন শ্রমিকের পক্ষে এই ঠিক পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কথা শেষ হবার মুহূর্তেই রুস্তমের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো। আমি একটু চমকে উঠলাম। রুস্তম আমার আপাদমস্তক দেখল। মনে হলো, তার চোখে যেন একটা অস্পষ্ট বিদ্রূপের ছায়া। এবং বিস্মিত অনুসন্ধিৎসাও রয়েছে। কেন? আমার এই পোষাকের জন্যে কি? আমি যে একজন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাড়ির ছেলে, এটা বুঝেই কি সে আমার সঙ্গে ঠিক একাত্ম হতে পারছে না? অবিশ্যি, তাতে আমি তাকে দোষ দিতে পারব না। আমার মন এবং হৃদয়ের সঙ্গে তার সম্যক পরিচয় এখনো হয় নি।

"আমি আবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার বাড়িতে কে কে আছে?"

" "ওঃ! সে শালা এক গুষ্টি, আর বলবেন না। আমার বিবি, পাঁচটা বাচ্চা, আর বুড়ি মা-টা শালা কিছুতেই মরছে না।"

"রুস্তম হেসে ফেলল। কঠিন আর করুণ সেই হাসি। বুঝলাম, বড় দুঃখে সে এমনি করে বলছে। আমার কাছে সে এখন অসঙ্কোচে নিজেকে প্রকাশ করছে। আবার বলে উঠল, "ওরাও সব ঘোড়াটার মতো বিনা দানাপানিতে মরে যাবে।"

"আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "ভাববেন না। সুদিন আসছে, যেদিন আর এভাবে—"

"আমার কথা শেষ হবার আগেই রুস্তম খিস্তি করে উঠল। আর দপদপিয়ে উঠল আমার কান। বুঝলাম, আমার এই শ্রমিক বন্ধুটির মধ্যে হতাশার গ্লানি কিছু রয়ে গিয়েছে। এবং আমি বিশ্বাস করি, সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। পারিবারিক জীবনের পরিবেশকে মানুষ সব সময়ে কাটিয়ে উঠতে পারে না। সে বলল, "কবে যে সে ভালো দিন আসবে…।"

"হাতটা উল্টে দিয়ে, একটা সরু গলিতে রুস্তম ঢুকে পড়ল, আর দাঁতে দাঁত পিষে যেন আমাকে ডাকল, "আইয়ে।"

"গলির মধ্যে ঢুকে যেন আমার দম বন্ধ হয়ে এলো। একটা বিশেষ অস্বস্তি বোধ করতেও লাগলাম। গলির মধ্যে গ্যাস-এর মৃদু আলো। কিন্তু মানুষের ভিড়ে, তাদের বড় বড় কিম্ভুত ছায়ায় অন্ধকার জমে রয়েছে। ভিড়ের মধ্যে নানান ধরনের, নানান বয়েসের লোক। আমার মনে হলো, তাদের কেউ কেউ মাতাল। মদের গন্ধ পাচ্ছি। আর খাটো খাটো ফ্রক পরা মেয়ে, যাদের শরীরগুলো অস্বাভাবিক রকমের উঁচু নিচু, খোঁচা খোঁচা। এরকম কয়েকজন আশে পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঘুরছে। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে, সিগারেট খাচ্ছে। পুরুষের কোমর ধরে দাঁড়িয়ে হাসছে। সব ব্যাপারটা কি রকম অশ্লীল মনে হলো এবং জীবনে কখনো এসব না দেখলেও, আন্দাজে আমার একটা ধারণা হলো, পাড়াটা ভালো নয়। যদিও সবাই প্রায় জঘন্য এক-ধরণের ইংরেজিতে কথা বলছে, তবু বুঝলাম, এটা খারাপ জায়গা।

"আমি রুস্তমকে না বলে পারলাম না, "এ রাস্তাটা ভালো নয়।"

"রুস্তম রীতিমতো অনুকম্পার সুরে বলে উঠল, "সে জন্যে ভাববেন না। এটা একেবারে রদ্দি পাড়া, ভিকমাংগাদের পাড়া বলতে পারেন। এ গলিটা

পেরিয়েই আমরা ভালো রাস্তায় পড়ব। সেখানে অনেক বড় বড় মোকাম, আর সবাই খুব শরিফ।"

"তবু এই নরক গলিটা যতক্ষণ শেষ না হলো, ততক্ষণ আমি প্রায় নিশ্বাস ফেলতে পারলাম না। কথা বলতে পারলাম না। কিন্তু—আঃ—! নতুন বড় রাস্তাটাও আমার তেমন ভালো মনে হলো না। সেই রাস্তায় ঢোকা মাত্র, কয়েকটা মাতালের মিলিত গলার, বিদেশী ভাষার খারাপ গান শুনতে পেলাম। এবং এখানেও জানালায় অলিন্দে আমি প্রায় সেই ধরণের মেয়েদেরই দেখতে পেলাম। যাদের চুল সোনালী এবং লাল রং করানো। ফ্যান্সি ড্রেসে যারা সেজেছে। আমি রুস্তমের দিকে তাকালাম।

"রুস্তম হাসল। ভরসা দেবার মতো হাসি। বলল, "ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাব। আমি যতক্ষণ আছি, কিছু ভাববেন না।"

"তা জানি! ভয় আমি মোটেই পাই নি। বরং বিস্মিত চমকে আমি ভাবলাম, আণ্ডার গ্রাউণ্ডের উপযুক্ত জায়গাই বটে। রীতিমতো রোমান্টিক। কে ভাববে, যুধাজিতের মতো শ্রমিক নেতা এখানে লুকিয়ে রয়েছে।

"খোলা গেটের ভিতর দিয়ে একটা বাড়িতে ঢোকবার আগে, রুস্তম আমাকে অনুসরণ করতে ইশারা করল। আমি ঢুকলাম তার পেছনে পেছনে। একটা ছোটখাটো হল ঘরে এসে পৌছুলাম। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হলো আমাকে। এ কি! এ কোথায় নিয়ে এলো। হল ঘরে দেখছি, তিন চারটি মেয়ে ইতস্তত চেয়ারে বসে রয়েছে। দুজনের হাতে মদের গেলাস। এও তো সে-ই। কী আশ্চর্য! এখানে কি যুধাজিৎ থাকতে পারেন, এই এদের সঙ্গে, একই বাড়িতে!

"আমাকে থামতে দেখেই রুস্তম চাপা গলায় বলল, 'দাঁড়ালেন কেন, আসুন? এরা আছে থাকুক, আমরা দোতলায় যাব।"

"মনে হলো রুস্তমের চোখে মুখেও এখন উত্তেজনা ফুটে উঠেছে। আমি তাকে অবিশ্বাস করতে পারলাম না, বরং আরো বিস্মিত হলাম। ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে ভাবলাম, যুধাজিৎকে কী ভয়াবহ পরিবেশেই না থাকতে হয়। ইস্! কিন্তু উপায়ই বা কী?

"হল ঘরের এক পাশ দিয়েই দোতলার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে আমি রুস্তমকে অনুসরণ করলাম। দোতলায় উঠে, বারান্দার এক পাশে,

একটা পর্দা-ঢাকা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রুস্তম দরজায় টোকা মারল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই, পর্দা সরিয়ে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না, এত খারাপ পোষাক সে পরে আছে। নগ্নতাও এর থেকে ভালো। সব থেকে খারাপ, সংক্ষিপ্ত জামাটির একটা হাতা একেবারে খোলা। আর তাতে—যাচ্ছেতাই। কী হচ্ছে ব্যাপারটা। মেয়েটি সোজা আমার দিকে তাকাল। চোখ কুঁচকে নিরীক্ষণ করল একটু। আর আমি শুনলাম, রুস্তম বলছে, "বহুৎ বড়া সাব আদমি হ্যায় মেমসাব, দেখ লাও। বহুৎ খানদানি···।"

"বলে সে আমাকে চোখ টিপল। আর মেয়েটি তার তর্জনী তুলে ইশারায় আমাকে ডেকে বলল, "হালো!"

"এ কি! এই রং মাখা ঠোঁট, সোনালী চুল, ভাল্‌গার শরীর মেয়েটা—মানে কী বলতে চায়? আমি রুস্তমকে বললাম, "যুধাজিৎ কোথায় আছেন?"

"রুস্তম মুখটা বিকৃত করে বলল, "কে?"

" "যুধাজিৎ?"

" "সেটা আবার কে? ওসব জুথাচিং-ফিং জানি না। এর থেকে আচ্ছা মেমসাব আর মিলবে না।"

"আমার বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল। তবু আমি রাগ সামলাতে পারলাম না। বললাম, "এখানে তোমাকে কে নিয়ে আসতে বলেছে। আমি—"

"রুস্তম খেঁকিয়ে উঠল, "তবে আর কোন্ বেহেস্তে নিয়ে যাব আপনাকে? এর থেকে ভালো আমি কিছু জানি না।"

"আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। ঘাম ঝরতে লাগল আমার। মনে হলো, আমার পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। বললাম, "এসব আমি কিছুই চাই না। আমি তো এখানে আসতে চাই নি।"

"মেয়েটা ঠোঁট উল্টে দিল। আর রুস্তম বলে উঠল, "তবে কি ইয়াকি হচ্ছিল আমার সঙ্গে এতক্ষণ! আরে শালা, কী রকম লোক! তখন থেকে ব-ক্ ব-ক্ করে চলেছে, হেনরে তেনরে, নিকুচি করেছে।"

"ভয়ঙ্কর খারাপ কথা আবার বলল রুস্তম। অর্থাৎ এই লোকটা, যাকে আমি ভেবেছি···। এখন দেখছি, সে একটা ইয়ে, মানে পিম্প। দালাল। মনে হলো, আমি পড়ে যাব। মেয়েটা এবার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে খিল্‌খিল্ করে

হেসে উঠল। আর আমি তৎক্ষণাৎ সিঁড়ির দিকে ফিরে, তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম।

"কিন্তু রুস্তম চিৎকার করে উঠল, "কেয়া বাৎ? ভাগছ কোথায় চাঁদ? চাও বা না চাও, আমার পাওনাটা দিয়ে যাও।"

"আমি ততক্ষণ সিঁড়ির মাঝখানে। তার কথার জবাব না দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি নেমে, হল ঘরটা পেরিয়ে গেলাম। যেন স্বয়ং যমের হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্যে, প্রায় ছুটতে লাগলাম। কোনোদিকে তাকিয়ে দেখলাম না। আমার পেছনে পেছনে চিৎকার ভেসে এলো, "এ বেঃ শালা, কোথায় ভাগছ। আমার মেহনতের দাম দিয়ে যাও আগে।"

"বলতে বলতে লোকটা আমার সামনে এসে, পথরোধ করে দাঁড়াল। সেই মুখ, সেই চোখ, কিন্তু কী বীভৎস দেখাচ্ছে। আর এখানো আমার মনে হচ্ছে, লোকটাকে শ্রমিকদের মতোই তো দেখতে। শহরতলীর সেই সব শ্রমিকদের মতোই···আশ্চর্য! শ্রমিকদের কি আলাদা করে চেনা যায় না। জঘন্য! আমি একটা মূর্খ!

"আরো দু-একজন এসে কাছাকাছি দাঁড়াল। রুস্তম বলল, "নিকালো, আমার পয়সা বার করো।"

"ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে কথাটা বলল রুস্তম। আমি পকেটে হাত দিলাম। কারণ তা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। যত তাড়াতাড়ি এ-নরক থেকে চলে যাওয়া যায়। রুস্তম আবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, "ফুটানি করে আবার বাজে কথা বলা হচ্ছিল, কি করে তোমার চলে, এ লাইনে আসবার আগে কি করতে···।"

"কিন্তু পকেটে আমার মাত্র একটি টাকাই ছিল। আমি সেটাই বার করে দিলাম। সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে রুস্তম বলল, "ব্যস্? আরো ছাড়ো।"

"আমি অসহায় ভাবে বললাম, "আর নেই আমার কাছে।"

"আমার পোষাকের দিকে তাকিয়ে, বীভৎস বিদ্রূপে হেসে রুস্তম বলল, "ফোকটকা বাবু। ধৃ-র ত্তেরি ।"

"সে সরে গেল। আশে পাশের লোককটাও হাসতে হাসতে চলে গেল। আমার শরীরটা যেন ভেঙে পড়ল। আমি টলতে টলতে ফিরে চললাম। আর অসহ্য রাগে, ঘৃণায় ও ধিক্কারে আমার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। আবার শুনতে পেলাম, লোকটা এখনো চেঁচাচ্ছে, "শালা ফোকটিয়া···আবার বিবি-বাচ্চার খবর করছিল।"

"আর ওর জলন্ত চোখ দুটো আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। শিকারী পশুর মতো সেই চোখ! কিন্তু···আঃ! জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছলাম আমি···"

রোজনামচার এই ঘটনাটির বিষয়ে আমি কোনো উক্তি করতে চাই নে।

নিরস্ত্রীকরণ কেন?

দেবেশ রায়

যদি এমন একটা অন্ধকার জায়গায় আরো অন্ধকার কামরাটার মধ্যে ঘণ্টা আড়াই থেকে চার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, যেখানে কামরা থেকে নামলেই চারপাশে অজস্র, সরল, পরস্পর সংলগ্ন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন রেল লাইন, মাথার ওপর অজস্র তার, স্তম্ভিত অন্ধকারের মতো স্তম্ভ, মাঝে মধ্যে সেই স্তম্ভিত অন্ধকারের মাথায় মৃত নক্ষত্রের নীল বা লাল আলো, রেল লাইনের পাশে মাটিতে পড়ে থাকা লাল বা নীল আলো, যেন, অন্ধকার, বা নক্ষত্র, বা মেঘের আকারে সর্বদাই যে সৌরজগত আমাদের পরিপ্রেক্ষিত সেখানে চরম বিপর্যয়ের ফলে কিছু নক্ষত্র, কিঞ্চিৎ-পরিমাণ সূর্য ও কিয়দাংশিক সূর্য ঐ থামগুলোর মাথায়, রেল লাইনের পাশে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। অথচ ফার্লং খানেক দূরে রেলস্টেশনের ব্রিজ, প্লাটফর্ম, এমন কি তার ওপর লোকজনকেও, কেবলমাত্র প্রখর আলোর নিচে কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও, দেখা যায়, রেলস্টেশনের চত্বরঘেরা রাস্তায় রিক্সা, মোটর ইত্যাদির আসা যাওয়া প্রভৃতি বোঝা যায়, এমনকি মাঝে মধ্যে কোনো কোনো মোটরের হেড্‌লাইটের আলো গিয়ার-চেঞ্জের গর্জনের সঙ্গে মিশে এই কামরা পর্যন্ত আসে ও সেই মোটর-রিক্সা-স্ট্যাণ্ডের চ্যাঁচামেচি গোলমাল দূরত্বে পরিশ্রুত হয়ে খুব দামী গাড়ির হর্ণের মতো কানে এসে পৌছয়, তবে, এই অন্ধকারে নির্বাসনের বর্তমানের সঙ্গে, মাইল চল্লিশ দূরের মফঃস্বল স্টেশনে লোকাল গাড়ির সঙ্গে কলকাতায় যাবার জন্য জুড়ে দেয়া এই একটা থ্রু-কোচের দরজায় জীবন যুদ্ধের মতো ঠেলাঠেলির অতীত ও আরো কতক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে বন্যার মতো বেগে এই কামরাটাকে অন্ধকার থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ট্রেনের আবির্ভাবের ভবিষ্যৎ—সব কিছুর যোগে নিজেদের বৃহত্তর কোনো শক্তির কবলিত আত্মস্বাতন্ত্র্যহীন বলে মনে হয়। এই অধীনতাবোধ এই ট্রেনের যাত্রীদের কুল-লক্ষণ।

সেই অন্ধকারের মধ্যে নির্বাসিত নিরালোক কামরার গভীরতর অন্ধকারের ভেতর দুই নারীর মধ্যে এ-রকম সংলাপ চলছিল।

"ওখানকার লোকজনও ছাড়তে চায় না, বলে চাকরি ছেড়ে দিন, আমাদের এখানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করুন, নিজের ডিসপেন্সারি করুন, যে, লোকজনের ভিড় লেগেই আছে, শেষে দিন পেছুতে পেছুতে এইবার যেতেই হলো"—ভদ্রমহিলার গলার স্বর মাঝারি-দামের জর্দা খাওয়া হাফ্-খান্দানী। বোঝা যায় না বেশি কথা বলার জন্য বনেদিয়ানা নষ্ট হয়েছে, নাকি পুরো বনেদিয়ানা তৈরিই হয় নি।

"সে তো সত্যি। এক জায়গায় থাকলেই লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়, মায়া পড়ে যায়"—দ্বিতীয় ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর নিষ্প্রভ, কিন্তু নিবে যায় নি, খুব বুঝে শুনে খরচ করা, মিতব্যয়ী!

একই বেঞ্চের জানলার দিকটা নিয়েছেন দ্বিতীয়া। তিনি পা ছড়িয়ে বেশি জায়গা নেয়ায়—তাঁর সঙ্গে বছর দশেকের একটি ছেলে আছে, বোধহয় তাকে শোয়াবার সঞ্চয়—প্রথমার বেশি জায়গা জোটে নি। অথচ তাঁর নতুন শাড়ি-পরা মেয়েটির সতীত্ব সংরক্ষিত করার জন্য একটি নিরাপদ জায়গা তাঁর প্রয়োজন।

অন্ধকারের মধ্যে অন্য খুপরিটায় একটি বাচ্চা তারস্বরে কাঁদছে।

দরজার হাতল ধরে দূরদৃশ্যদর্শনরত কোনো অন্যমনস্ক যুবক চেঁচিয়ে এমন একটা গান গাইছে যার সুরে রামপ্রসাদী গানের বক্তব্য কিন্তু কথায় শারীরিক সান্নিধ্যের আতুরতা, ফলে হ্রস্ব, ধ্বন্যাত্মক।

দুই নারীর সংলাপ। প্রথমা—"উনি আবার গেলেন কিছু খাবার-দাবার কিনে আনতে, আমার আবার রাস্তার খাবার পেটে সয় না—।" দ্বিতীয়া—"তাহলে বাড়ি থেকে বানিয়ে আনলেই পারতেন। আমি তো সঙ্গে এনেছি। এ-শ্রীমানের আবার আমার ধাত। ট্রেনের খাবার খেলেই পেটের গোলমাল। আর-এক ছেলের আবার উল্টো। তিনি হোটেলে খেতে গেছেন।" প্রথমা—"আর বলবেন না দিদি, দোকানে খেয়ে খেয়ে শরীর নষ্ট করবে, তারপর ধকল সামলাতে হবে আমাদের। তুই বোস্ না খুকু এদিকে।" প্রথমা পা একটুও সরালেন না—"থাক্ না একটু জানলায় দাঁড়িয়ে। চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকতে থাকতে এর পর তো হাতে পায়ে খিল ধরে যাবে।"

বাচ্চাটার কান্না ঘিরে একটি পুরুষ ও একটি রমণীতে এই প্রকার কথোপকথন চলছিল :

পুরুষ—"দাও না একটু বুকের দুধ—"

রমণী—"দিচ্ছি না নাকি? দেখছো তো মুখেই নেয় না—"

পুরুষ—"কী বিপদ! সারারাত এভাবে কাঁদলে—"

রমণী—"না না এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে। সোনা সোনা ওই দেখো আলো—ভু-উ-স—হো-ই যা—ঝিক-ঝিক-ঝিক।"

অতঃপর কান্না ও কান্না থামানো ক্রমাগত উচ্চ গ্রামে উঠতে উঠতে এমন একটা স্তরে উঠল যখন পুরুষ "দাও দেখি আমার কাছে" বলে, নিয়ে, সেই গান গাওয়া যুবকের পাশ দিয়ে হাতল ধরে ঝুলে লাল নীল আলোয় ও জটিল রেলপথে বিশৃঙ্খল অন্ধকারে নেমে গেল। রমণী অন্ধকারের জানলায় নিজেকে উৎকণ্ঠ করে সেই প্রান্তরে ভ্রাম্যমান কান্নার পিছু পিছু দৃষ্টি ঘোরাতে লাগল।

দুই নারীর সংলাপ। দ্বিতীয়া—"প্রথম পোয়াতি, বোধহয় বাচ্চা নিয়ে বাপের বাড়ি থেকে যাচ্ছে।"

এতৎসহ কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞের হাসি। প্রথমা—"শিখবে শিখবে, আমরাও কি আর একদিনে শিখেছি?"

দ্বিতীয়া—"আপনার ষাটের কটি?"

প্রথমা—"এই তো মেয়ে। আর এক ছেলে কলকাতায় ডাক্তারি পড়ে—"

দ্বিতীয়া—"বাপের পেশা?"

প্রথমা—"হ্যাঁ, অন্তত রিট্যায়ার করবার সময় ওঁর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা দিয়ে একটা ওষুধের দোকান করে দেয়া যাবে। আর কিছু না হোক, অন্তত ওষুধ বেচে তো খেতে পারবে।"

দ্বিতীয়া—"তা কেন বলছেন? ও দেখবেন আপনাদের চাইতে বেশি কামাবে—"

গায়ক-যুবা হঠাৎ একলাফে কামরা থেকে নেমে পায়চারি করতে লাগল। অত জোরে লাফের পর অতটুকু পায়চারি মোটেই ওকে মানায় না। বাচ্চার কান্নাটা হঠাৎ হাউইয়ের মতো উঁচুতে উঠতেই রমণী দরজায় গিয়ে "এই" বলে চেঁচাতেই পুরুষ তার হাতে বাচ্চাকে তুলে দিতেই বাচ্চা মায়ের বুকে মুখ গোঁজে। রমণী নিজের আসনে এসে বসে। পুরুষ মাটি থেকে জানলার দিকে উগ্র হয়ে বলে—"স্টেশনে খোঁজ করব নাকি—দুধটুধ যদি—"

রমণী—"যাও, বক্‌বক্ কোরো না।"

দ্বিতীয়ার খোকা বলল—"মা, রুন্টু দা কোথায়"

"খেতে গেছে।"

"আমাকে নিয়ে গেল না কেন ?"

"তোমার খাবার তো এখানেই আছে।"

"ওর খাবারও তো আছে—"

"চুপ করো, ঐ দেখো পাহাড়ের আলো দেখা যাচ্ছে—"

প্রথমা—"এটিই বুঝি কোলের ?"

দ্বিতীয়া—"হ্যাঁ। পাঁচ ছেলে চার মেয়ে—"

প্রথমা মনে মনে ভাবলেন এতবার গর্ভবতী ভদ্রমহিলার পাশে তার খুকীকে বসতে দেয়া উচিত কি না ?

প্রথমা—"ভদ্রলোক কী করেন ?"

দ্বিতীয়া—"ছেলেরা দাঁড়িয়ে গেছে, এখন কিছু করেন না।"

প্রথমা—"বড় ছেলে কি করে ?"

দ্বিতীয়া—"বিলেতি কোম্পানির, ওষুধের—কীরে খোকা ?"

খোকা ঘাড় ঘুরিয়ে "রিপ্রেসেনটেটিভ" বলে আবার ঘাড় ফিরিয়ে নিল।

প্রথমা—"কোন কোম্পানির ?"

খোকা এবার মায়ের আদেশের অপেক্ষা না করেই ঘাড় ফিরিয়ে নামটা
বলল। ডাক্তারের স্ত্রী বুঝে উঠতে পারলেন না যে রিপ্রেসেনটেটিভের মায়ের
সঙ্গে বেশি কথা বলা তাঁর উচিত কি না। তাই তিনি অন্য ছেলেদের পরিচয়
জানতে চাইলেন। দ্বিতীয়া জানালেন—"মেজছেলে বাড়িতে থেকে এক
স্কুলে চাকরি করে। ন-ছেলে কলকাতায় খবরের কাগজ অফিসে চাকরি
করে। তার কাছে সেজছেলে এম-এ পড়ে। সেজছেলের সঙ্গে যাচ্ছি।"

"ছেলেমেয়ের বিয়ে দেন নি ?"

"হ্যাঁ, বড়ছেলে আর বড় দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছি—"

"তাহলে তো দিদি আপনি ঝাড়া হাত-পা—"

এরপর একসঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলো ঘটল : সূর্য উঠলে মৃত্যু রোধ
হবে এ রকম বর-পাওয়া কোনো পৌরাণিক বীরের মতো সবগুলো লোকের
একমুখী দৃষ্টি, সূর্যের প্রথমতম রশ্মির মতো মৃদু আলো, বাংলাদেশের যাত্রায়
যে-রকম বেগ ও প্রচণ্ডতার সঙ্গে বিবেকের পরিবর্তন দেখানো হয়, সেই রকম

দ্রুত প্রচণ্ড বেগে সব কিছু কাঁপিয়ে ও আলোকিত করে ট্রেনের আগমন আর সঙ্গে সঙ্গে এই কামরার অন্যান্য যে-সব যাত্রী এতক্ষণ প্রবাদবাক্যের বহ্নিমুখ-মুমুক্ষু পতঙ্গের মতো এতক্ষণ প্লাটফর্মের আলোর বৃত্তে ঘুরঘুর করছিল, তারা সূর্যোদয়ে নীড়-ছাড়া পাখিদের মতো সমবেতভাবে আলোকিত হয়ে এই কামরার দিকে ছুটে এলো। যে নিজের নাস্তিকতা ও ভগবদ্ বিরোধিতাকে এত কম আঘাতে আস্তিক ও ঈশ্বরমুখী করে তোলে, যাত্রাগানের সেই অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য ক্ষণে ক্ষণে হৃৎ-পরিবর্তনকারী চরিত্র এই ট্রেন আর এই সমবেত চরিত্রের তুলনা হলো কেন ? এই আত্মপরিবর্তনে সে কি পুনরায় নাস্তিকতায় প্রস্থানের পথ রেখে দিয়েছে !

ট্রেনের ইঞ্জিন এসে এই কামরাটাকে নিয়ে যাবে। সবাই তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এম-এ পড়া সেজ ছেলে সিগারেট খাচ্ছিল। হু-হু করে ট্রেনটা ছুটে চলেছে। মরা একটা জ্যোৎস্না আছে আকাশে। ফলে পরিবেশ বিচিত্র জটিল অবাস্তব রূপ নিয়েছে। ট্রেনের জানলা দিয়ে গলে আলো বাইরে পড়েছে। খরস্রোতা নদীর মতো সে আলো ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে।

প্রথম খুপরিতে সব জায়গা-টায়গার ব্যবস্থা করে সেজছেলে এখানে এসেছে। ট্রাঙ্কের ওপর বেডিং দিয়ে চাদর বিছিয়ে সকন্যা প্রথমার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। হাঁটু পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে এক মাড়োয়ারি ভদ্রমহিলা ও পাশে সদানিদ্রিত তার রক্ষকের পাশে ডাক্তারবাবু বোধহয় এতক্ষণে কাত হয়ে পড়েছেন। কোত্থেকে পোর্টফোলিও ব্যাগওয়ালা এক ভদ্রলোক এসে দলের সঙ্গে মিলে গেছেন। তিনি এক বাঙ্কে, সেজছেলে এক বাঙ্কে।

সবাই মিলে বেশ শুয়ে যাওয়া যাচ্ছে। ডাক্তারবাবুর মেয়ের জন্য একটু লোভ আছে সেজছেলের মনে। সে বাঙ্কে চলে গেল।

সেই শিশুকেন্দ্রিক পুরুষ রমণীতে সংলাপ। পুরুষ—"নাও এখন দুধটা খাইয়ে দাও।"

রমণী—"এখনি ?"

পুরুষ—"আবার কি, রাত্রি দশটা বেজে গেছে—"

রমণী—"ঐ ব্যাগ থেকে স্পিরিট ল্যাম্পটা বের করো—"

পুরুষ—"কই ? এতো গেলাস—"

রমণী—"ঐ তো ওর নিচে আর-ই—তোমার বাটিটা"

পুরুষ—"আমার বাটি ?"

বৌটি হেসে ফেলল। বরটি স্পিরিট ল্যাম্প, বাটি ও দুধের বোতল বের করতে করতে বলল—"যাক্। তুমি তাহলে এখনো ঠাট্টা তামাসা বোঝো—"। কোলের বাচ্চার কপালে হাত বুলিয়ে বৌটি বলল—"কেন ?" স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালতে জ্বালতে ভদ্রলোক—"গত চারদিন তো দেখি নি, তাই—"। বৌটি চোখ নিচু করে বাচ্চার ভুরুতে আঙুল দিয়ে "আহা-হা।" স্পিরিট ল্যাম্পের ওপর বাটি চাপিয়ে দুধ ঢালতে ঢালতে ভদ্রলোক "তুমি আড়াই মাসের এক বাচ্চা নিয়ে আমার দিকে যে ভাবে গত চারদিন তাকিয়েছ তাতে তো মনে হচ্ছিল আমি তোমার ভাসুর ঠাকুর বা মেশোমশাই।" "কী যে বলো না, তোমার মাথার ঠিক নেই।" "যাক্, কপালে আরো কী লেখা আছে কে জানে ? এখন বাচ্চার দুধ গরম করতো হচ্ছে—এরপর হয়তো—।" "তা করতে হবে না, নাকি ? আমার কি একার দায় ?" বলে বৌটি বাটি থেকে এক ঝিনুক দুধ তুলে বাচ্চার মুখে দিতেই তারস্বরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল বাচ্চা, ভদ্রলোক বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"হলো তো, দুধ খাওয়ানোটাও শেখ নি ?" "খ্যাঁচ খ্যাঁচ করো না তো, চুপ করে বসে থাকো—"। "হ্যাঁ। সারাদিন এক ঝিনুক দুধ পড়ল না পেটে, আমি তো চুপ করেই থাকব—"। "তাহলে তুমি-ই খাওয়াও।"

বাঙ্কের ওপর ও সামনের বেঞ্চিতে সেই গীতরসিক যুবক তার আরো তিন বন্ধুসহ শুয়ে। এই প্রচণ্ড কান্না ও ঝগড়ায় তাদের একজন—"ঘুমের বারোটা বেজে গেছে—"

পাশের খুপরির দ্বিতীয়া, অর্থাৎ খোকা ও সেজছেলের মা উঠলেন—এখন আর জায়গা যাবার ভয় নেই—"রুনু, তোর ঠাণ্ডা লাগছে না তো ?" (সেজছেলে "না") বলে উঠলেন ভদ্রমহিলা, এ-খুপরিতে এসে নতুন পিতাকে বললেন—"উঠুন।" "অ্যাঁ" বলে ভদ্রলোক উঠলেন। খোকার মা তাঁর জায়গায় বসতে বসতে বৌটিকে শুধোলেন "প্রথম বাচ্চা।" বৌটি "হ্যাঁ" বলে দুইবার মাথা ঝাঁকাল। বৌটির কোল থেকে বাচ্চাকে কোলে নিলেন খোকার মা। বাচ্চা আরো কেঁদে উঠল। বৌটি আবার নেবার জন্য হাত বাড়াতেই খোকার মা বললেন "আরে রাখো।" তারপর বাটি থেকে এক

ঝিনুক দুধ নিয়ে কান্নার জন্য হাঁ করা বাচ্চার গলায় ঢেলে দিলেন। হঠাৎ কান্না থেমে গেল, ঢোকৎ করে একটা শব্দ। তারপর আবার প্রচণ্ডতর কান্না। আবার এক ঝিনুক। ঢোকৎ। বাচ্চার বাবা চেঁচিয়ে উঠল—"বিষম লাগবে।" খোকার মা বললেন—"ওদিকে যাও তো হে, আমি ন ছেলেমেয়ের মা। শোনো মা, ঝিনুকের মধ্যে এ রকম এক আঙুল ডুবিয়ে খাওয়াবে।" ভদ্রলোক হঠাৎ বৌটির ওপর রেগে গিয়ে বললেন—"বাতাস দাও না—দেখছ না ঘেমে গেছে।" পেছন থেকে এক পাখা বের করে বৌটি হাওয়া দিতে শুরু করল। ততক্ষণে দুধও শেষ। বাচ্চাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে দিতে খোকার মা জিজ্ঞাসা করলেন "বাড়িতে নিশ্চয়ই মা আছেন।" বৌটি হাসল। "আর শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ি ?" মেয়েটি আবার হাসল। "ব্যস, ঐ বুড়ির কোলে ফেলে দেবে—সব ঠিক হয়ে যাবে।" দ্বিতীয়া নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। বাচ্চা শাড়ির কোন ভাঁজে অদৃশ্য। বাচ্চার বাবা একটা সিগারেট ধরিয়ে বাচ্চার মায়ের পাশে বসতে বসতে বলল—"তুমি একটি অপদার্থ।"

"হ্যাঁ, বলা খুব সোজা মশাই। তোমার হলে বুঝতে—"

"এ কী আমার না নাকি ?"

"এই, কী যে বলো, খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু, বাঃ আমি তাই বলেছি নাকি, কোনো মানে হয় না—যাঃ।"

এই সংলাপের কিছু অংশ নিঃসন্দেহে চার যুবকের কানে গেছে। তাদের একজন—"মদন, কটা বাজেরে ?"

"এই ধর, সাড়ে দশ, পনে এগারো—"

"এখুনি স্থরু—" বলে একজন খুব কুঁকিয়ে পাশ ফিরল।

"মদন"

"এঁ্যা"

"তোর নামটা এত খারাপ কেন রে ?"

"পছন্দ না হয় বদলে নে। লাইনে দাঁড়িয়েছি, তোদের পছন্দটা তো আগে দেখতে হবে—"

"এই, সিগারেট দে" একজন উঠে বসে "শালা পরীক্ষায় যে কী হয়—"

"কি আবার হবে। আমেরিকার স্পুটনিক। দশ বার আছাড় খেয়ে এগারোবারে পাশ করবি—"

"ও-সব কথা ছাড়ো চাঁদ, তৈরি তো করেছে—সে দশবারেই হোক, এগারো বারেই হোক।"

আর একটি গলায়—"রাত্রি বারোটার কাছাকাছি। রাজনীতি নিষেধ।"

"মাইরি, যুদ্ধ যুদ্ধ এ চ্যাঁচানি আর ভালো লাগে না। কী দরকার বাবা আমাদের পরীক্ষা দেয়া, পাশ করা, চাকরি খোঁজায়—কোনদিন ফটাস করে বোমা ফাটাবে, ব্যস, ভবলীলা সাঙ্গ—"

সিগারেটটা জানলা দিয়ে গলিয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে "তার চাইতে মেয়েছেলেফেলে দিয়ে দে, দুদিন ফুর্তি-ফার্তি করে টেঁসে যাই—"

"নো স্ল্যাঙ্ প্লিজ।"

"আরে আমার মানিক রে। রাত্রিবেলা ট্রেনে যাচ্ছি, একা একা, খিস্তি করব না। তোমার গোঁফজোড়া নিয়ে আমি কী করব বলতে পারো।"

"শালা তোর গোঁফটা কাট মাইরি, তোকে শেষে মিনিষ্টার বানিয়ে দেবে।"

"মাইরি আর ভালো লাগে না, কলকাতা যাচ্ছি, ধর, এই ট্রেনটা অ্যাকসিডেণ্ট হলো।"

"অ্যাকসিডেণ্ট ইজ অ্যাকসিডেণ্ট।"

"হ্যাঁ, যখন সমস্ত নিয়মকানুন মেনে সব দিকে নজর রেখে, সব কিছু ঠিক করে, ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও কিছু হয় তখন বলা যায় অ্যাকসিডেণ্ট। তো এদের শালা ইঞ্জিন বানাবে, চাকা লাগাবে না—ওটাকে অ্যাকসিডেণ্ট বলে না, বুঝলি? আচ্ছা ওটা না হয় অ্যাকসিডেণ্ট, ধর ডাকাত উঠল—উঠে তোর কাছে তোর প্রাণটা ছাড়া কিছু পেল না, ঐটা নিয়ে চলে গেল—"

"আরে বাবা মরার জন্য অত ডাকাত-ফাকাতের দরকার কী, রটিয়ে দিলেই হয় যে অসুখে মারা গেছে—"

খুকীর মা আপাদমস্তক চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছেন খুকীকে। বাঙ্কের ওপর এম-এ পড়া সেজছেলে খুকীর মুখ দেখতে পারছে না। মেয়েটাও মুখটা বের করছে না। ওঃ। কী দোষ ছিল রাতের ট্রেনের একটি মাত্র মেয়ের একটু চঞ্চলা হতে?

গাড়িটা স্টেশনে থামার জন্য বাঁশি বাজাতে ও বেগ কমাতে শুরু করতেই সেজছেলের বিপরীত বাঙ্কে পোর্টফোলিও ব্যাগসহ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—"দরজার ছিটকিনি আটকে দিয়েছেন?"

সেজছেলে ইতিমধ্যেই বিরক্ত। সে পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল—"গাড়িটা তো আর আমি রিজার্ভ করি নি।"

বাঙ্ক থেকে নামতে নামতে পোর্টফোলিও বললেন—"মাসে দু-বার আমাকে এই লাইনে যাতায়াত করতে হয়। এই স্টেশন থেকে চোর ওঠা সুরু হয়—"

ডাক্তারবাবু বেঞ্চের ওপর উঠে বসেছেন—"অ্যাঁ? চোর?"

বেঞ্চের নিচে জুতো-জোড়া খুঁজতে খুঁজতে পোর্টফোলিও বললেন—"জি-আর-পি-তে গিয়ে খবর নিন, রোজ রাত্রিতে এ ট্রেনে পাঁচ-সাতটা চুরি হবেই—"

ডাক্তারবাবু একবার নিজের সব মালপত্রের দিকে তাকালেন। পাশের খুপরিতে গিয়ে পোর্টফোলিও জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনারা সব কলকাতা তো?" বর উত্তর দিল—"হ্যাঁ", যুবকদের একজন উত্তর দিল—"হুঁ"। অতঃপর দরজার ছিটকিনি আটকে দিয়ে "যতই ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি করুক, স্টেশন ছাড়া কিছুতেই দরজা খুলবেন না" বলে ভদ্রলোক নিজের জায়গাতে ফিরতেই ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, এ-রাস্তায় কী খুব চুরি হয়?"

"প্রতি রাতে পাঁচ-সাতটা।"

"কি চুরি হয়?"

"পারলে ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, বেডিঙ—মানুষ অব্দি। আর না পারলে গলার হার, কানের দুল—এইসব—"

শুনে খুকীর মা উঠে বসায়, খুকীর মুখ থেকে চাদরটা সরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এমন হাঁ করে চুরির গল্প শুনছে খুকী যে, সেজছেলে সযত্নে বাঁধা বেণীর ফ্রেমে আঁটা একটা অতি কচি মুখ দেখল। পোর্টফোলিও এই সব গল্প বলছিল—"আরে মশাই, ভাবা যায়, এই তো সেদিন রাঁচি এক্সপ্রেসে—দেখেছেন তো কাগজে? ভাবা যায়, যে, যাতে, ডেড্‌বডি ধরা না পড়ে সেজন্য হাত-পা-মাথা কেটে কেটে ছড়াতে ছড়াতে গেছে। তারপর ঐ যে, চারটি কলেজের মেয়ে কোত্থেকে ফিরছিল, ব্যস। তারপর দুন্ এক্সপ্রেসে নাকি এক বাচ্চাকে, তার মায়ের কোল থেকে, চলন্ত গাড়িতে, নিয়ে, নেমে গেছে, আর তারপর টাকা ডিম্যাণ্ড করে চিঠি দিয়েছে—"

বৌটি বাচ্চাকে তার বুকে জড়িয়ে বলল—"যত সব বাজে কথা।" বরটি

বলল—"হ্যাঁ, ফার্স্ট ক্লাস ছেড়ে তোমার এই থার্ডক্লাসে আসতে যাবে কে ?" বৌটি বলল—"ফার্স্ট ক্লাসের চাইতে থার্ডক্লাসে ঢোকা অনেক সহজ, দরজাটা খুলো না বাবা—"

বাঙ্কের ওপর থেকে এক যুবক গলা চড়িয়ে বলল—"কেন, মনে নেই আপনাদের সেই বিরাট কেস ?" ডাক্তারবাবুর গলা শোনা গেল—"কি ? কি ?" আর এক যুবক চাপা গলায় বলল—"কী হচ্ছে ? এই ?" "দাঁড়া না, মজা করি," বলে গল্প বলা যুবক পাশের খুপরির দিকে মুখটা বাড়িয়ে বলল—"সেই যে, খুন করে ট্রাঙ্কে ভরে জংশন স্টেশনে নেমে গিয়ে পরের দিন আর এক ট্রেনে ওটা বুক করে দিয়ে বাবু অন্য ট্রেনে উঠে বসলেন—" ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর গলা শোনা গেল "অ্যাঁ"। যুবকটি আরো উৎসাহের সঙ্গে বলা সুরু করল—"আর সেই যে—।" আর একটি যুবকের কণ্ঠ এই যুবককে থামিয়ে দিল—"এই, চুপ কর তো, এ ট্রেনে ও-সব কিছু হয় না, আপনারা ঘুমোন, দরজাটা না খুললেই হলো।" প্রথম যুবকের আক্ষেপ—"ওঃ, শালা সাধুপুরুষ এসেছেন ? দিতাম একটু ভয় খাইয়ে।"

রাতটাকে দু-ভাগে চিরে যেন অন্ধবেগে ট্রেনটা ধেয়ে চলেছে। কামরায় বসে ট্রেনের গর্জন, দুলুনি, আর মাঝে মাঝে কাঁপা বাঁশি শুনে মনে হয়—দুটো লোহার লাইনের ওপর বাষ্পচালিত ইঞ্জিন নয়, যার কর্তৃত্ব অন্ধ নিয়তির হাতে তেমনি কোনো যন্ত্রের ওপর নিজেদের এই জীবন-রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এই ইঞ্জিন অন্ধকার থেকে এই কামরাটাকে উদ্ধার করে এনেছিল। তখন এই ইঞ্জিনকেই মনে হয়েছিল জীবন-বিধাতা। বস্তুত এই কামরাটায় মাত্র কিছুক্ষণ আগে কোনো এক বিশেষ জীবন যে মধুর তার অনস্বীকার্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। আবার এই মাত্র সেই বিশেষ জীবনে মৃত্যুও যে ধ্রুব এবং তার আক্রমণের স্থান কাল ভেদ নেই—তারও স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। অর্থাৎ, জীবনটা যেন বড়লোকের বাড়ির নানারঙা জানলা, কোনটা ঠিক রঙ তা বোঝা যায় না। অর্থাৎ যাত্রাগানের সেই দায়িত্বহীন চরিত্রটি এবার ট্রেনের সঙ্গে এই নবজাত শিশু থেকে প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব ডাক্তারের জীবনেরও তুলনা হয়ে যায়—আস্তিকতা-নাস্তিকতা, জীবন-মৃত্যু ইত্যাদিতে যে প্রতিনিয়তই নিজেকে বিশ্বাসী করছে।

তার প্রাণভোমরা নিহত হয়েছে টের পেয়ে মরবার জন্য রাক্ষসের ছোটার মতো বা শেলাহত লক্ষ্মণকে বাঁচাবার জন্য গন্ধমাদন নিয়ে পৌরাণিক বীরের ছোটার মতো—ট্রেনটা ছুটছে। এই কামরার ভেতরে তখন সনাতন জীবনের এমন একটা ছবি যা দেখে ইতিহাসকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, মনে হয়, জীবন একটি প্রাচীন ভাস্কর্য, সহস্রাব্দের দ্বারা যার স্থায়ী সৌন্দর্য পরীক্ষিত। ছবিটা এই প্রকার : বাচ্চাকে বুকে নিয়ে সেই নতুন বউটি বরের কোলে মাথা রেখে, হাঁটু মুড়ে ঘুমিয়ে আছে ; বরের একটি হাত বউয়ের খোঁপার ওপর ; কামরার আলো কমে যাওয়ায়, নাকি রাত্রি গভীর হওয়ায় খুকীর মুখটা ধীরে ধীরে ভরে উঠছে, সেজছেলে তাকিয়ে আছে যেন একটি কুঁড়ির ফুল হওয়া দেখছে ; সেজছেলের মা খোকাকে সবখানি জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিজে সামান্য একটু জায়গায় কুঁকড়ে আছেন।

ইতিহাসের প্রভাবমুক্ত এই আদি ও অকৃত্রিম সনাতন জীবন কামরায় নিয়ে থামোখা ট্রেনটা পথের মাঝখানে একবার থেমে, খানিকক্ষণ বাঁশি বাজিয়ে আবার চলা সুরু করল। আর তার কিছুক্ষণ পরই দরজায় সেই অমোঘ শব্দ, যে শব্দে শতাব্দীর নাম, বৎসরের নাম, আর গ্রহের নামটা মনে করিয়ে দেয়।

প্রথমে খুব আস্তে আস্তে দু-বার, আর যেন প্রায় আদেশের মতো "দরজাটা খুলুন।" কথাটা সবাই শুনেছিল, কেউ সাড়া দিল না। বার কয়েক ঐ কণ্ঠস্বর শান্ত নির্দেশের মতো থেকে "দরজাটা খুলুন" বলে চেঁচিয়ে উঠল। ট্রেন তার ক্ষণবিরতির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তখন আবার বেগ নিচ্ছে। ডাক্তারবাবু উঠে বসলেন। সেই একই কণ্ঠস্বরে "দরজাটা খুলুন" শুনে ডাক্তারবাবু দাঁড়ালেন। এবং পরের পর "দরজাটা খুলুন" শুনেই পোর্টফোলিও ভদ্রলোককে ধাক্কা দিলেন। "চুপচাপ শুয়ে থাকুন, দরজা খুলবেন না" বলে ভদ্রলোক পাশ ফিরলেন। ডাক্তারবাবু বসে পড়লেন। "দরজাটা খুলুন।" সেজছেলে চেঁচিয়ে উঠল—"আরে মশাই, দরজাটা খুলে দিন না।" ডাক্তারবাবু কাতর কণ্ঠে বললেন—"দরজা খোলাটা কি ঠিক হবে, মানে স্টেশন আসার আগে ?" "করুন গে যা ইচ্ছে"—সেজছেলে পাশ ফিরল। "এই সুভাষ, দরজাটা খুলে দে তো"—চার যুবকের এক যুবক বলল। "দরজাটা খুলুন না"—এবার বড় করুণ শোনাল গলাটা। ট্রেন তখন পূর্ণবেগে চলছে। বাইরে একটি লোক ঝুলছে—এই কথাটি বোধহয় সবাইকেই খানিকটা অস্থির করল। এক যুবক ডাক্তারকে বলল, কেন না ডাক্তার তখন এই খুপরিতে এসে দাঁড়িয়েছেন, "যান না দরজাটা খুলে দিন।" "দেব ?" ডাক্তার

এগুলেন। আর এক যুবক—"হ্যাঁ দিন, মানে ছিটকিনিটা দরজার আড়াল থেকে খুলবেন—মানে দরজাটা খুললে আপনি যাতে তার আড়ালে পড়েন।" "মানে ?" ডাক্তারবাবুর প্রশ্ন শুনে যুবকটি হেসে উঠল। "না না এমনি বলছিলাম, যান খুলে দিন।" ডাক্তারবাবু দরজার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, তারপর ছিটকিনিটায় হাত দিতেই দরজায় প্রথম লাথিটা পড়ল—"দরজাটা খুলুন, খুলুন—" আর সঙ্গে সঙ্গে সেই লাথি আর চিৎকারকে যেন ডুবিয়ে দিতে ট্রেন বাঁশি বাজিয়ে গম গম করে একটি ক্যালভার্ট পেরিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু পিছিয়ে এলেন আর এই কামরার মানুষগুলো একসঙ্গে জেগে উঠল। চিত্রবৎ।

দরজায় সেই করাঘাতে পদাঘাতে পূর্ববর্তী সনাতন জীবনের বিপর্যয় এ-রকম: বৌটির খোঁপা ভেঙে কাঁধের ওপর, চারজন যুবকই মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে, সেজছেলে আর পোর্টফোলিও পরপর, ঘুমন্ত খোককে আঁকড়ে সেজছেলের মা বসে, খুকীকে রেখে ডাক্তার-গিন্নি স্বামীকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে, খুকী যেন সেই মুহূর্তেই বয়ঃসন্ধি পেরল।

শতাব্দীর নাম, খ্রীষ্টাব্দের নাম আর এই গ্রহের নামের প্রশ্নটা চাকায় চাকায় গম্‌গম্‌ করে বেজে চারপাশে ছুটে যাচ্ছে।

"বাঁচান, বাঁচান, দরজাটা খুলুন, খু-লু-ন"—দরজায় লাথির শব্দ, তার সঙ্গে টিনের জানলায় ঘুষি। ছিটকিনিটা থরথর করে কেঁপে উঠল। সেই চার যুবকের একজন গম্ভীরভাবে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ছিটকিনিতে হাত দিল। আর সেই নতুন-পিতা তার কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কী করছেন ?"

"দেখতেই পাচ্ছেন"—যুবকটি ছিটকিনি তুলতে গেল।

"দরজা খুলুন" দরজায় লাথি পড়তেই ছিটকিনিটা কেঁপে উঠল।

"দরজা খুলবেন না"—বলে সেই নতুন-পিতা যুবকটির হাত ছিটকিনি থেকে এক হ্যাঁচকায় সরিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বাকি তিন যুবকের একজন তখন এগিয়ে এসেছে। "মানে ?"

"মানে দরজা খুলতে দেব না—"

"মানে—ঐ মারা লোকটা যাবে—"

"মারা যাবে কেন ? নেক্সট স্টেশনে খুলব—"

"ততক্ষণ ঐ লোকটা হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলবে ?"

পেছন থেকে পোর্টফোলিও চিৎকার করে উঠল—"কিসের লোক মশাই ? মাঠের মাঝখানে ট্রেন থামল, আর তারপরই "দরজা খুলুন", কোত্থেকে আসবে লোকটা ? খবরদার, দরজা খুলবেন না—"

"হ্যাঁ, দরজাটা না খোলাই বোধহয় ভালো হবে—" ডাক্তারবাবু বললেন।

"দরজাটা খুলুন, মারা গেলাম, খুলুন"—লাথি ও ঘুষি এবারও পড়ল, কিন্তু নতুন পিতা দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে ছিটকিনিটায় ঝন্‌ঝন্‌ করে কোনো শব্দ হলো না।

অকস্মাৎ ওপাশের সেই হাঁটু পর্যন্ত ঘোমটা দেয়া সেই ভদ্রমহিলা চিৎকার করে কেঁদে উঠতেই, সেই কান্নার শব্দে চমকে জেগে খোকা কাঁদতে স্থরু করে দিল, খোকাকে বুকে জড়িয়ে ঠাকুর ঠাকুর করে খোকার মা বসে পড়লেন, "মা" বলে খুকী তার মাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল, আর বাচ্চা বুকে পাগলের মতো প্রথম খুপরির নতুন-মা ছিটকে এসে পড়ল দ্বিতীয় খুপরিতে।

দরজায় মাথা কোটার শব্দ "খুলুন খুলুন—দরজাটা খুলুন।"

"আপনারা কি মানুষটাকে মেরে ফেলবেন নাকি ?" একটি যুবক এগিয়ে এলো, নতুন-বাবাকে এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে দিল। আর ফলে ট্রেনের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে টুকুর টুকুর করে ছিটকিনিটা দুলল—আর পোর্টফোলিও পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন "খবরদার, দরজা খুলবেন না—"

পোর্টফোলিও আর নতুন-বাবা পাশাপাশি দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। যুবকটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল—"আপনারা কি লোকটাকে খুন করতে চান ?"

"আপনারা কি এতগুলো লোককে খুন করতে চান"—পোর্টফোলিও চেঁচিয়ে উঠলেন, "রাস্তার মাঝখানে থামা গাড়িতে লোক উঠবে কোত্থেকে মশাই ?"

"আপনাদের মতো লোকের তো আর অভাব নাই, এতক্ষণ হয়তো অন্য কামরায় ঝুলছিল—"

"দরজাটা খুলুন—দরজাটা খুলুন—বাঁচান"—ট্রেনটাকে যেন ভূতে পেয়েছে—এত প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। একটা সঙ্কীর্ণ দরজার এ-পাশে ও-পাশে জীবন, মৃত্যু, হত্যা, জন্ম—সব মিলেমিশে একাকার। দরজাটা স্বচ্ছন্দে প্রশ্নচিহ্নের আকার নিতে পারত।

"আমরা দরজা খুলব—" একজন যুবক নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে এলো।

আর ওদিককার পাঁচটি নারী একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—"না—আঁ।" আঁ-টা শেষে কান্নায় ভেঙে ট্রেনের শব্দের সঙ্গে মিশে গেল।

"দরজা খুলতে দেব না"—শ্লেষ্মা-জড়িত কণ্ঠে ডাক্তারবাবুর এই কথা সমস্ত ঘটনাকে যেন চরম মুহূর্তের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

যুবকটি পোর্টফোলিও ও নতুন-বাবার সম্মুখে এসে বলল—"সরুন।"

"না—"

সেজছেলে এতক্ষণ কোনো কথা বলে নি। তার মা ও ভাইয়ের কথা মনে রেখে শুধু ভেবেছে—যদি মা ও ভাই না থাকত তবে তো আমি নিশ্চিত যুবকদের দিকে যোগ দিতাম। মা আর ভাই আছে বলে আমি ওদের বিপক্ষতা করি কি করে? এইবার সে বলল—"ঐ জানলাটা খুলে আগে দেখে নিন না, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।"

"না না না, জানলা খুলবেন না—" বলে দরজার কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে সেজছেলেকে টেনে নিয়ে কানে কানে কী বললেন পোর্টফোলিও। সেজছেলে বিস্ফারিত চোখে চার যুবকের দিকে তাকাল। সেই একই কথা পোর্টফোলিও নতুন-বাবাকে কানে কানে বললেন। নতুন-বাবা হঠাৎ ভুরু কুঁচকে দরজা-খোলার পরের বিপদকে সামনে দেখল এমন করে তাকাল। "কি" বলে ডাক্তারবাবু কানটা এগিয়ে দিলেন, তারপর শুনে "এঁ্যা" বলে দেয়ালে হেলান দিয়ে প্রায় মূর্ছা গেলেন।

চার যুবকের এক যুবক চিৎকার করে উঠল—"এই চলে আয়—"

আর একজন—"না, যাব না, একটি লোক মারা যাচ্ছে, আর—"

আগের জন—"চলে আয়, দেখছিস না, ওঁরা আমাদের ডাকাতদলের লোক বলে সন্দেহ করছেন—"। বাইরে প্রবল কান্নার মতো গলায় "দরজাটা খুলুন"—, সটাং শব্দ করে ট্রেনটা বোধহয় একটা পোড়ো গুমটি পেরিয়ে গেল। সেই যুবক বলল—"এরপর কিছু হলে—"

সেই চার যুবক মানুষের প্রেতাত্মা হয়ে পেছনে হাঁটা শুরু করল, তারপর খুপরির মুখটাতে এসেই ঘুরে তাড়াতাড়ি আড়ালে চলে গেল; এই আলোতেও ওরা পরস্পরকে দেখতে চাইছিল না। যদি ওরা দরজা খোলে, আর যদি বাইরের লোকটা চোর ডাকাত কিছু হয়, যা হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে, না হওয়ার সম্ভাবনা ততোধিক, তবে ওদের হাজতবাস করতে হতে পারে—আত্মরক্ষার এই প্রত্যক্ষ প্রশ্নে হয়তো বা ওরা বাইরের ঐ হয়তো

দুর্বল আশ্রয়প্রার্থীকে হত্যা করল। হত্যা না করেও বিপদ, আর আত্মরক্ষা না করেও গ্লানি। অথচ নিয়মিত ব্যবধানে দরজায় আঘাত পড়ছে। আর সোঁ সোঁ শব্দে শতাব্দীর নাম, খ্রীষ্টাব্দের নাম, আর গ্রহের নাম জিজ্ঞাসা করতে করতে ট্রেনটা ছুটছে।

ডাক্তারবাবু, পোর্টফোলিও, নতুন-বাবা, সেজপুত্র—দরজা ছেড়ে দাঁড়িয়েছেন, আর ছিটকিনিটা টুক্ টুক্ করে দুলছে। সবাই মাঝেমধ্যে ওটার দিকে তাকাচ্ছেন, যেন ওটা একটা জীবিত অস্তিত্ব।

আর এই চারজনও নিজেদের ভেতর দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছে আত্মরক্ষা করার মৌলিক অধিকার খাটাতে গিয়ে, মৃত্যুকে হটাবার মৌলিক মানবিক অধিকারকে কি দরজার বাইরে ফেলে দেয়া হলো। পোর্টফোলিও অবিশ্যি একবার ছিটকিনিটায় হাত দিলেন, তারপর হেসে এই তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাদের সঙ্গে ফ্যামিলি আছে, আমি তো একা, একবার খুলে দেখলে—" কিন্তু কেউ কোনো সাড়া না দেওয়ায় তিনি ঐ দরজাটার ওপরই খানিকটা এলিয়ে পড়লেন—প্রতিরোধের জন্য নয়, নিজেকে সেই জীবন বা মৃত্যুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ করবার জন্য। নাকি তিনি ঐ চার যুবককে যে সন্দেহ করেছেন, তাঁকেও আর সবাই ঐ সন্দেহ করবে, যদি তিনি দরজা খোলেন!

এই সঙ্কীর্ণ কাঠের দরজায় কে আঘাত করছে? হত্যা না মৃত্যু? এই চার যুবক কোন দলের? মারবার না বাঁচাবার? এই চার মানুষ কী চায়? মারতে না বাঁচতে? জীবন কি এই কামরায় নারী আর শিশুতে কাঁদছে, নাকি বাইরে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলছে। এটা কী বাঁচা না মারা? ট্রেন এই বাষ্পচালিত মহান্ যন্ত্র, কামরার ভেতরের লোকগুলোকে বাঁচাচ্ছে নাকি বাইরের লোকটাকে মারছে? সঙ্গমরত দুই সাপের মতো বিচিত্র জটিল বন্ধনীতে আশ্লিষ্ট এই দুই প্রশ্নের আলাদা দেহ চেনা যায় না।

বাইরে ট্রেন প্রবল শব্দে হু হু গর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড বাঁশি বাজিয়ে বাঁক নিচ্ছে। আগুনের ফুলকি ছুঁড়ছে আকাশে।

পরের স্টেশনে দরজা খুলে কাউকে পাওয়া গেল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকারে থেকে যারা শেষে একটা বড় গাড়ির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে পথে বেরিয়েছিল, তারা আত্মরক্ষার আরাম ও স্বস্তি এবং হত্যাকারীর বিষাদ ও গ্লানিতে আর-এক মানুষ হয়ে তাদের গন্তব্যে পৌঁছেছিল। কিন্তু মানুষগুলিই বদলে যাওয়ায় গন্তব্যও আর স্থির থাকে নি।

শতকের নাম, দশকের নাম ও গ্রহের নাম দিয়ে যে বর্ষফল প্রকাশিত হবে, নিঃসন্দেহে, তাতে, মানুষের এই বদলে যাওয়া ও গন্তব্যে না পৌঁছুনোর খবর থাকবে। ফলে অপরিবর্তিত সনাতন মানুষের গন্তব্যে পৌঁছুনোর সংবাদও নিশ্চয়ই একদিন পাওয়া যাবে।

তারা পাঁচজন

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

অবশেষে নিত্যানন্দই এক গলা জল খেয়ে ঢাউস হয়ে ফুলে উঠল। এতক্ষণ ও এমনভাবে ঝাঁপাঝাঁপি করে তোলপাড় করেছে যেন নৌকো তোলার সব দায়িত্বটাই ওর। আর যারা আছে তারা সব থাকতে হয় তাই থাকা। অবশ্য তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নৌকোর কোনো হদিশই পাওয়া যাচ্ছিল না। কেবল মাটি তোলাই সার হচ্ছিল। এমন সময় নিত্যানন্দই কাণ্ডটা বাধিয়ে তুলল।

বেণী একবার বলেছিল বটে, "আর একটুন পুব দিক ঘেঁসে এগিয়ে গেলে হয় না! আমার মনে হয় পুব দিকেই সরে গেছে নৌকাটা।"

পুবে যাওয়ায় আশ্চয্যি নেই। ঝড়ের সময় জলের টান পুব মুখোই ছিল। তা, ঐ টুকুন তো নৌকো, চাই কি ডুবতে ডুবতে দু-চার-শ হাত পুবেও চলে যেতে পারে। সবাই যখন সাঁতার কেটে পুব দিকে এগোতে যাবে এমন সময় নিত্যানন্দ বলল, "দাঁড়াও দেখি, কেমন যেন একটা পায়ে লাগল, আর একটুন ডুবে দেখি!" বলেই গাবুৎ করে আর একখানা ডিগবাজী খেয়ে ও জলের তলায় ডুবতে লাগল। ডুবতে ডুবতে গোঁত্তা খেয়ে বাঁয়ে ঘুরতেই হট করে বুকের পাঁজরায় এমন একখান খিঁচটান খেলো যাতে ওর ব্রহ্মবায়ু বেরয় বেরয়।

কেমন যেন 'লদাই কান্ত' হয়ে গেল ও। গব গব করে বেশ কয়েক ঢোক কাদাগোলা গিলে ফেলল। চট করে মুখ বন্ধ করল বটে, তবে বুঝতে পারল নাকের ফুটো দিয়ে গল গল করে জল ঢুকছে। ঝিমঝিম করে কেমন যেন মাথাটা জলে যাচ্ছে গো, অথচ কিছুই তখন আর করবার নেই। ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগল নিত্যানন্দ। তলাতে তলাতে আর যাই হোক মাটি পাবে ভেবেছিল, পেল না। থ হয়ে তাকিয়ে দেখল, মস্ত কালো মতো একটা সুরঙ্গ দেখা যাচ্ছে। সুরঙ্গের মুখে শামুককুচি, মনসা-কাঁটা আর মাকড়শার জাল জড়িয়ে আছে। ভিতরটা বড় অন্ধকার। তাই থেকে গোলানো গোলানো

অদ্ভুত মতো সাদা রঙের একটা শব্দ বেরুচ্ছে। শব্দ শুনে কেমন যেন থিতিয়ে পড়ল ও। এখান ওর পালিয়ে আসা দরকার। পালিয়ে আসবার জন্য ভাসতে চেষ্টা করল নিত্যানন্দ। ভাসতে ভাসতে এক সময় ও শুশুকের মতো ভুস করে পিঠ উজিয়ে উপরে উঠল। মাথাটা তখনও গদার মতো ভারী। জলের তলায় কেউ যেন ঠেসে ধরেছে। শক্ত মতো কিছু একটা পেলে খিমচে ধরা যেত। নিত্যানন্দ দু-হাত দিয়ে জল খিমচতে লাগল। পা-দুটো শোলার মতো হালকা। ও দুটোকেই উপরে তুলে ছড়ফড় করে আছড়াতে লাগল। ফলে ঝটকায় ঝটকায় জল লাফিয়ে ওর চতুর্দিকে বৃষ্টির মতো পড়তে সুরু করল।

নিত্যানন্দের কাণ্ড দেখে হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছে বাকি চারজন। বেণী বলল, "ধুর শালা, যত সব দুধ খেকোদের নিয়ে কারবার!" বিভু বলল, "হারামজাদা একটা গাবর।" মতি আর কলকি ওকে ঠেসে ধরে জলের উপর জাগিয়ে তুলল। তারপর জলের ভাঁজে ঘাই মেরে মেরে ওরা ওকে পাড়ের দিকে নিয়ে চলল।

পাড়ে অনেক দূর অবদি থিতোন কাদা। ভস ভস করে হাঁটু ডুবে যায়। কচলানো কচলানো গন্ধ। তারই ভিতর লেপটে লুপটে টেনে নিয়ে ওরা নিত্যানন্দকে পাড়ে তুলল।

অবস্থা দেখে মুখ শুকিয়েই যাওয়ার কথা। "বেটা কেমন লেদিয়ে পড়েছে রে! এই বিভু, পেটে ঠাস দে, জল বার কর!" জল বার কর! বলল কলকি।

বিভু ওর কোমরের দু-পাশে দু-হাঁটু চালিয়ে দিয়ে যেন ঘোড়ায় বসার মতো তাক করে বসে চাপ কষাতে লাগল। ভক ভক করে খানিকটা বমির মতো লোত বেরুল মুখ দিয়ে। কাজ হচ্ছে দেখে পেছন থেকে পা দুটো উঁচু করে তুলে ধরল কলকি।

বেণী বলল, "কপালে আমাদের অনেক রকম দুঃখু আছে বুঝতে পারছি। কি কুক্ষণেই যে একসঙ্গে পাঁচ মূর্তি রওনা হয়েছিলাম।"

মতি বলল, "তোরা ওকে সুস্থ কর, আমি গ্রাম থেকে একটু দুধ জোগাড় করে আনি। এক চুমুক গরম দুধ খাইয়ে দিলেই দেখবি চাঙ্গা হয়ে উঠবে।"

খিস্তি করে বিভু বলল, "আস্ত একটা গাই ধরে আন, বসিয়ে রেখে চোষানো যাবে।" বলতে বলতে আবার ওর ঢাউস পেটে চাপ কষাতে লাগল। হড়হড়

করে লোত গড়াচ্ছে নাক দিয়ে। মতির কেমন গা ঘিনঘিন করে কেঁপে উঠল, "আমি একুনি চট করে আসি রে"—বলেই ও গ্রামমুখো হাঁটতে স্বরু করল।

কিন্তু নিত্যানন্দ তখন বুঝে উঠতে পারছিল না ও জলের নিচেই পড়ে আছে, না ডাঙায় উঠে এসেছে। কারণ সাদা রঙের সেই গা গোলানো শব্দটা তখনো ওর কানে লেগে আছে। শব্দটা ওর কান থেকে মুছে না গেলে কিছুতেই ও সুরঙ্গটার কথা ভুলতে পারবে না আর। সুরঙ্গের মুখে শামুক ঝিনুক মনসাগাছ আর মাকড়শার জাল। ভিতরটা বড় অন্ধকার। অথচ অন্ধকারটা পেরুলেই যেন এমন কিছু একটা দেখা যাবে যা ও কোনোদিন দেখে নি। একটু যদি কষ্ট করে ভেতরে ঢোকা যায় তা হলেই—তা হলেই যেন এমন একটা ব্যাপার হয় যা ওর ধ্যান-ধারণার বাইরে পড়ে আছে এখন।

বিভু যেন ময়দা ডলছে এমন ভাবে ওর মাজা রগড়াচ্ছে। কলকি ওর পা দুটোকে শূন্যে তুলে এমন ভাবে ঝাঁকাচ্ছে যেন গদা ঘোরাচ্ছে। বেণী বলল, "যাওবা ও বেঁচে আছে তোরা দুজনেই মেরে ফেলবি দেখছি।"

বিভু বলল, "মরলে একটা পাপ যায়।"

"তা বটে! তুই মরলে পুণ্যি যেত।" বেণীর চোখদুটো কুঁচকে ছোট হয়ে এলো।

কলকি বলল, "রোস না বাপু, মরতে দিচ্ছি কেমন দেখ না! এই, সরে যা তো বিভু, মাথার উপর বাঁই বাঁই করে এক পাক ঘুরিয়ে ওর পেটের জল বার করে আনি!" তা, চোটপাট করে বলল বটে, তবে এক পাশে বসে পড়ে কাদার উপর পা ছড়িয়ে নদীর দিকে তাকাল।

মতি তখন হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের পাশটায় চলে এসেছে। ভরা দুপুর। লোকজন বড় একটা নজরে পড়ল না। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে শেষটায় একটা শুঁড়িখানার সামনে এসে দাঁড়াল। মাতাল মাতাল গন্ধে ভুরভুর করছে চারদিকটায়। মাছি ঘুরছে, পিঁপড়ে হাঁটছে। এককোণে কচু ঝোপের মধ্যে বসে লেড়ি কুত্তায় কি যেন একটা ছাল চিবোচ্ছে। কিন্তু, লোকজন সব গেল কোথায়! মতি তখন গলা কেশে ডাকল, "ও কর্তা, কেউ আছ গো।"

একজন হাড়গিলে লোক বেরিয়ে এলো, "কি চাই?"

"একটু দুধ হবে? বড্ড 'প্রেয়জন'।"

হাড়গিলে লোকটা মদ টেনে বুঁদ হয়ে আছে বুঝতে পারল মতি। তবু জ্ঞান কেমন টনটনে। শুধাল, "মশায়ের নিবাস?"

নিবাস বলল মতি। নৌকার কথা বলল। নিত্যানন্দের অবস্থা জানাল।

হাড়গিলে লোকটা শুনল কি শুনল না বুঝতে পারল না মতি। কারণ ও তখন মতিকে পিঁড়ি পেতে বসতে দিয়ে নিজেও সামনে এসে বসল। তারপর মাতালরা যেমন যেমন কাণ্ড করে তেমন তেমন কাণ্ড করতে লাগল। বলল, "আমায় এখন এই শুঁড়িখানার মালিক হিসেবে দেখছেন, দশ বছর আগে আমি এক জাহাজে চাকরি করতাম।"

লোকটা বড় বাজে বকে বুঝতে পারল মতি। কবে ও কোন জাহাজে চাকরি করেছে এসব শোনবার সময় নেই ওর। দুধটুকু পেলেই ও বাঁচে। তবু ভব্যতার ভয়ে হাড়গিলের কথায় ও ঢোক গিলে সায় দিয়ে যেতে লাগল।

"তা, মশাইয়ের মুখে রা নেই কেন? একগাল হেসে লোকটা রসিকতার ঢঙে প্রশ্ন করল। বলুন এবার কতখানি দেব আপনাকে? একবার খেলে আর একবার আসবেন।"

মতি বলল, "সে সব অন্য সময় এসে খাওয়া যাবে, এখন একটু দুধ না হলে—"

"এই দ্যাখো! হাড়গিলে লোকটা আশ্বাস দিল, দুধ ও জোগাড় করে দেবেই, তবে অতিথ মানুষ একটুখানি 'বৌনি' করে যেতে হয়।"

মতি বলল, "বউনি কি গো, পয়সা কড়ি যে কিচ্ছু আনি নি।"

"সে সব আপনি অন্য সময় দিয়ে যাবেন। অতিথ মানুষ, একটুখানি খেতে হয়, নইলে অমঙ্গল হয় গেরস্থের।"

মতি এক ঢোক খেল।

লোকটা বলল, "দশ গাঁয়ের লোক আমার কাছেই ছুটে আসে।"

মতি আর এক ঢোক খেল।

লোকটা বলল, "বিকেলে এলে বিনিপয়সাতেই আমি চাট দেই।"

মতি আর এক ঢোক খেতে খেতে পা দুটো টেনে নিয়ে জুত করে বসল।

সুরঙ্গের মুখে শামুক-ঝিনুক মনসা-কাঁটা আর মাকড়শার জাল দেখতে পাচ্ছিল নিত্যানন্দ। যেন, অনেককাল আগে ঐ গুহার মধ্যে এমন একটা কিছু ঘটে গেছে যা কিছুতেই ও স্মরণে আনতে পারছে না। অথচ ঘটনাটা যেন কিছু-দিন আগেও ওর জানা ছিল। মাছের মতো জলের মধ্যে এদিক ওদিক সাঁতরে বেড়াতে লাগল নিত্যানন্দ। ঘুরে ফিরে আবার সেই সুরঙ্গের মুখে। অথচ এমন ধারা অন্ধকার যে ঢুকতে কিছুতেই সাহস হচ্ছে না। ঢুকলেই যেন সাদা রঙের শব্দটা ওকে এমন ভাবে চেপে ধরবে যে ও দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। মাথাটা এমন লোহার মতো ভারী, নিত্যানন্দ কি ভাবে যে পালিয়ে আসবে ভেবেই উঠতে পারল না। ফলে ভারী মাথায় সাঁতার কেটে কেটে এপাশ ওপাশ করতে লাগল।

মুখ দিয়ে পিছল পিছল অনেকখানি জল বেরিয়ে গেলে বিভু একটু উঠে এসে ওর এলানো মাথাটা তুলে ধরল। নাকের কাছে আঙুল এনে একটুক্ষণ ধরে রেখে বুঝতে পারল নিত্যানন্দর নাকের মধ্যে কেমন একটা ঘসর ঘসর শব্দ হচ্ছে। বোধহয় এখনো কিছু জল রয়েছে। এখনো তাই শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। ঝুঁকে পড়ে বিভু ওর নাকের ফুটোয় ফুঁ দিয়ে বাতাস ঢোকাতে লাগল।

কলকি বলল, "শালার রোদের তাতে ছাল বাকল সব জলে যাচ্ছে গো। একটু আবডালে ছাওয়ায় বসতে পারলে হতো।"

বেণী বলল, "রোসো, আমি একটা মস্ত মতো ঝাপড়ানো ডাল ভেঙে আনি।"

বিভু বলল, "যাবি যা তবে এক চাপ থুতু ফেলে যা, শুকুবার আগেই কিন্তু আসতে হবে।"

বেণী বলল, "আমি তো আর মতি নই যে দুধ আনতে গিয়ে গায়েব হব।"

কলকি বলল, "দুধ ফুদ সব বাজে কথা। আসলে ওটা মজা মারতে গাঁয়ে ঢুকেছে।"

বেণী বলল, "আমি তো আর গাঁয়ে যাচ্ছি না যে মজা মারব। ঐ দূরের জঙ্গলটা থেকে একটা ডাল ভেঙে নিয়েই ফিরে আসব।"

নিত্যানন্দের অবস্থা মোটামুটি ভালোর দিকে লক্ষ্য করায় বিভু ওর কোমরে জড়ানো কাপড়টাকে মেলে ধরল হাওয়ায়।

কলকি বলল, "যা তবে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন!"

বেণী জঙ্গলটার দিকে এগোতে লাগল।

হোগলা আর কাশবনের মধ্যে দিয়ে সরু একটা পায়ে-হাঁটা পথ। তেতে-পুড়ে একাকার হয়ে পড়ে আছে। খানিক দূরে এগোতেই রাস্তাটা দু-মুখো হয়ে দু-দিকে গেছে। একটা পথ গ্রাম বরাবর লক্ষ্য করল বেণী। আর একটা পথ জঙ্গলের দিকে। এদিক ওদিক দুটো একটা বাবলা গাছ। একটা তেতুল গাছও দেখা গেল বটে, তবে কার গাছ কে জানে! বেণী জঙ্গলের দিকেই এগোতে লাগল।

ভেজা কাপড় গায় শুকিয়ে খটখটি মেরে গেছে। মাজার কাছটায় খানিকটা এখনো ভিজে। মাজার কষি আলগা করে দিতে দিতে সামনের দিকে তাকিয়ে খানিকটা কৌতুক বোধ করল ও। জনা দুই লোক দেখা যাচ্ছে। আর ছোট্ট মতো একটা হোগলার ছাউনী। কি সব যেন হিসেবে পত্তর করছে ওরা। এগোতে লাগল বেণী।

একজন একটু রোগা মতো, আর একজন বেশ মানানসই। রোগামতো মাটিতে কি যেন আঁকিবুকি করছিল। বেণী এসে দাঁড়াতেই ওর দিকে তাকাল। অপর লোকটি না তাকিয়েই একটা জল ভর্তি ঘটির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে বলল, "আলগা করে খেয়ে নাও।"

বেণী বুঝল পথের ধারে এটা একটা জলছত্র। যারা জল দান করে তারা সব পুণ্যবান।

বেণীর জল তেষ্টা না পেলেও কয়েক ঢোক জল খেল। তারপর কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য একটুখানি হাসল।

মানান সই লোকটি প্রশ্ন করল, "কোত্থেকে আসা হচ্ছে?"

বেণী ওদের সব ঘটনাই খুলে বলল।

রোগা মতো লোকটি বলল, "নৌকো ডুবির কথাই কি যেন শুনোছলাম কাল। ওঠানো হয়েছে 'নিশ্চয়'।"

"নাহ্ কে আর ওঠাবেন! মাঝখান থেকে আমাদের নিত্যানন্দটাই একটা চোট খেয়েছে।" বেণী মাটির আঁকিবুকির দিকে তাকিয়ে কৌতুক বোধ করছিল। শুধাল, "আপনি বুঝি হাত-টাত দেখছিলেন এতক্ষণ।"

রোগা মতো লোকটি বিনয়ে চোখ ছোট ছোট করে হাসল। "না না, মানে এই হয়ে আর কি!"

বেণী বলল, "আমিই বুঝি ভণ্ডুল দিলাম?"

"না না, ভণ্ডুল আর কি, বসুন না।"

বেণী উৎসাহ পেয়ে বসে পড়ল।

সুরঙ্গের মুখে শামুক-কুচি মনসা-কাঁটা আর মাকড়শার জাল দেখা যাচ্ছে। ভিতরটা বড় অন্ধকার। ঠাস বুহুনি অন্ধকার। তারই মধ্যে থেকে গা গোলানো শব্দ আসছে। সাদা রঙের ঝিঁঝিট কাটা শব্দ। শব্দটা ওর কানের পর্দায় লেগে আছে। গুহার মধ্যে ঢুকতে না পারলে রক্ষে নেই, ওর এমন ধারা মনে হচ্ছে। ঢুকলে পরেও রক্ষে নেই, শব্দটা ওকে চেপে ধরবে। আচ্ছা ভেজালেই পড়ল নিত্যানন্দ। যা থাকে কপালে, ঢুকবার জন্য গোঁত্তা খেতেই মাকড়শার জাল গায় লাগবে ভয়ে পিছিয়ে এলো। মাকড়শার জাল না কাঁটা তার গো। গায়ে লাগলেই গুটিয়ে এসে বেঁধে ফেলবে। অথচ কোনো ক্রমে একবার যদি ঢোকা যেত, হয়তো এমন কিছু দেখতে পেত নিত্যানন্দ যা ও জন্মাবধি দেখে নি। গুহার ওপাশে এমন কিছু লুকিয়ে আছে যা ও কোনোদিনই জানল না। নিত্যানন্দ মাছের মতো ঘুরতে লাগল।

বিভু বলল, "দেখলি তো, মতি আর বেণীর কাণ্ড দেখলি! এই গেল তো সেই গেল।"

কলকি বলল, "আমি আগেই জানতাম। মন ওদের অন্য জায়গায়।"

"তাই বলে নৌকাটা যে ডুবে রইল ক্ষতিটা এতে কার শুনি?"

"যে ভাববে তারই ক্ষতি।"

"তাই বুঝি একটা কথা হলো।" বিভু নিত্যানন্দের দিকে তাকাল। নিত্যানন্দ চোখ বুজেই পড়ে আছে। শ্বাস টানছে মুখ দিয়ে। গলার পাশে লোল শুকিয়ে চড়চড় করছে।

নদীর দিকে তাকাল। জলের নিচে কোথায় কি লুকিয়ে আছে কিচ্ছুটি এখন বুঝবার জো নেই। ওপরটা বড় শান্ত বলে মনে হলো বিভুর। অথচ গতকাল তুফানে পড়ে কেমন একটা পাগলামো যেন মাথায় চেপেছিল।

কলকি হঠাৎ মাজার কাছে একটা খোঁচা মেরে বিভুকে ডাকল, "এই, এই বিভু, ঐ ছাখ!"

বিভু ঘুরে, খানিকটা কান্নি মেরে দেখল একটা বউ-গোছের মেয়েলোক একা একা চলেছে।

কলকি বলল, "দাঁড়া একটুখানি ডেকে শুধিয়ে নেই।"

বিভু বলল, "শেষটায় 'কিন্তন' মারধর খাবি।"

"যাহ্ বাবা, এর মধ্যে আবার মারধরের কি দেখলি!" কলকি উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল, "ও দিদি শুনবেন।"

মেয়ে লোকটা থমকে দাঁড়াল। তারপর মাথার কাপড়টা সরিয়ে একগাল হাসতে চেষ্টা করল। এমন একটা অঙ্গভঙ্গি করে হোগলা জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে এগোতে লাগল যেন অনেক কালের চেনা ওদের।

বিভু ফিসফিস করে বলল, "আমার কিন্তু ভালো মনে হচ্ছে নারে।"

কলকি বলল, "ভূত তো আর নয়, মানুষই, দেখা যাক না কি বলে।"

"উহ্, কি রোদ্দুর গো!" বলতে বলতে মেয়েমানুষটা এগিয়ে এলো। ঘোমটাটাকে কাঁধের উপর পুরোপুরি টেনে নামিয়ে শুধাল, "ও মা এ আবার কে গো, ব্যামো বুঝি?"

কলকি বলল, "ডুবে গিয়েছিল।"

"তাই বুঝি!" খিল খিল করে হেসে উঠল ও। "বুড়োধাড়ী আবার ডুবেছে কি কথা গো, "সাঁতার আসে না বুঝি!"

"আসে, তবে—" সমস্ত কথা খুলে বলল বিভু।

কলকি বলল, "আপনারা তো এদিককারই লোক—"

"অমন আপনি আপনি করো না দেখি।" অনেকটা ধমকের সুরেই আবদার দেখিয়ে বলল মেয়ে মানুষটা।

কলকি বিভুর দিকে তাকাল। বিভু কেমন শক্ত হয়ে বসে আছে। কলকি বলল, "একটা হালকা মতো গেরাফি জোগাড় করে দিতে পারো। তাহলে আর অনর্থক ডুবিয়ে ডুবিয়ে হয়রান হতে হয় না।"

"এ আর এমন বড় কথা কি গো! তবে আমার সঙ্গে এলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

কলকি আবার বিভুর দিকে তাকাল। যেন বিভুকে ও সুযোগ দিচ্ছে। দেখ, যেতে পারিস কিন্তু! গেরাফি ছাড়া, ইচ্ছে থাকলে অন্য কিছুও জোগাড় করে আনতে পারিস।

বিভু বলল, "তা হলে তুমিই একবার যাও না ওর সঙ্গে। তবে কত দূর যেতে হবে শুনি।"

"কতদূর আবার। এই হাটখোলা অবদি। আজ হাটবার।"

"সেতো ক্রোশটেক গো!" কলকি বলল। হাটখোলায় মুড়ি গুড় চিবিয়ে গত রাত কাটিয়ে এসেছে ওরা। হাটখোলার কথা মনে আসায় খানিকটা যেন তাপ পেল কলকি। বলল, "তা হলে তুই বোস। আমিই যাই।"

মেয়েমানুষটার কপালের ওপর কালো টিপ চকচক করে জ্বলছে যেন। বিভু ওর চোখের দিকে তাকাতেই সাহস পেল না।

খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল কলকি। মেয়েমানুষটা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কলকি বলল, "টিনের বাক্স থেকে দুটো টাকা বার করে দেতো!"

"দু-টাকা!" চোখ বড় বড় করে তাকাল বিভু।

"দে না। আট দশ আনা তো গেরাফির জন্যই লাগবে। আর বাকিটাও কাজে লেগে যেতে পারে।"

"মানে!"

"ধেৎ তোর!" চাপা ধমকানির স্বরে কলকি বলল। "মেয়েমানুষটাকে দেখেও চিনতে পারছিস না। দে দে, বার কর! ঘুরে এসে সব বুঝিয়ে দেব।"

সুরঙ্গের মুখে শামুক-ঝিনুক মনসা-কাঁটা আর মাকড়শার জাল। ভিতরটা বড় অন্ধকার। ঢুকতে গেলেই তীরের মতো কাঁটা লাগবে। গা হাত পা ছিঁড়ে পড়বে। এত শত বুঝতে পেরেও নিত্যানন্দ তাক খুঁজতে লাগল। ঢুকতেই হবে। ঢুকতেই হবে। শব্দটা ওকে চেপে ধরবে! ধরুক না, তবুও ও সুরঙ্গটুকু পেরিয়ে যাবে। রহস্যটা জানতেই হবে। জানতেই হবে। সোঁ সোঁ করে জল কেটে এগোতে লাগল নিত্যানন্দ।

বিভু তখন ঘোলাটে চোখে চারপাশে একবার তাকাল। মতি কলকি বেণীর উপর মনে মনে ঝাল জমতে লাগল ওর। কাণ্ড দেখ সবার। দায় বলে কি কিচ্ছু নেই গো! একসঙ্গে তবে বেরিয়েছি কেন!

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঢিলে পায়ে পায়চারি করল বিভু। বহুদূর পর্যন্ত হোগলা কাশের মাঠ দেখা যাচ্ছে। নদীর ওপারেও মাঠ। রোদ পড়ে নদীর

জল আয়না খেলছে। বিভু নিত্যানন্দের দিকে তাকাল। নিত্যানন্দ নাকে মুখে শ্বাস টানছে। কিন্তু, রোদের তাতে দরদর করে ঘাম ছুটছে বুক বেয়ে। আহা গো বড্ড বেচারা কষ্ট পাচ্ছে। এ সময় বেণীটা যদি ফিরে আসত, একটুক্ষণ ও ছাওয়ায় থাকতে পারত। সব শালার উড়নচণ্ডী।

উদ্দেশ্যহীন রাস্তা ধরে এগোতে লাগল বিভু। কোথায় যেন বাউল গান সুরু হয়েছে। চমকে উঠে ক্ষীণ গলার দু-একটা বোল শুনল বিভু। এদিক ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে ভালো করে আঁচ করবার চেষ্টা করল।

এই রোদেও বাউল গাইবার সখ হয়! বিভু অবাক হয়ে জঙ্গলের দিকে হাঁটতে লাগল। খানিকদূর এগিয়ে এসেই একটা হোগলার চালা দেখতে পেল। চালার নিচে জনাকয়েক লোক বসে। গানটা তবে ওখানেই গাইছে কেউ।

বিভু এগোতে এগোতে বুঝতে পারল, জলছত্র ওটা। এক ঘটি জল চেয়ে ঢকঢক করে গিলে খেল। তারপর বলল, "বাবাঃ যা রোদ্দুর।"

বাউল গানের শ্রোতাটি গায়ে পড়েই কথা বলল ওর সঙ্গে, "মশাই বুঝি নদীর পাড় থেকে আসছেন।"

বিভু বলল, "হুঁ, আপনি জানলেন কি করে।"

"আপনাদের বেণীও এসেছিল কি না! ও একটা তাবিজ আনতে গেছে।"

"তাবিজ!" অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বিভু।

"হ্যাঁ হ্যাঁ তাবিজ! মাদুলি যাকে বলে!"

বিভুর কাছে সব ব্যাপারটাই ঘোলাটে হয়ে উঠল। বাউল গাইছে যে, সে হাটের খদ্দের। হাটে যাবে। গলাখানা বড় খাসা। জুত করে উঠে বসল বিভু! কয়েক কলি শুনেই যাওয়া যাক। বেণীটা কোথায় মরতে গেছে কে জানে! বেণীর কথা শুনতেও আর ইচ্ছে হলো না।

সুরঙ্গের ভিতর ঘাই মেরে ঢুকে পড়ল নিত্যানন্দ! চতুর্দিকে আঁধার-গোলা থিকথিক করছে। চতুর্দিকে শব্দ ছুটছে ঝড়ের মতো। মনসা-কাঁটা হাতে বুকে মাথায় পায়ে ফুটে বসছে। দরদর করে রক্ত এলো। রক্তের ভিতর ডুবিয়ে ডুবিয়ে এগিয়ে চলল নিত্যানন্দ। মুখে কেমন নোনতা স্বাদ। চোখ দুটো ছিঁড়ে খুড়ে এখনি যেন বেরিয়ে আসবে।

একবার ভাবল পিছিয়ে আসে, আবার ভাবল এগিয়ে যায়। এগিয়ে

গেল নিত্যানন্দ। সোঁ সোঁ করে গুহার ভিতর ছুটে চলল। ছুটতে ছুটতে দেহটা যখন অবশ, সব চেতনা যখন একেবারে স্থঁচের ডগায় উঠে এসেছে তখন ও বুঝতে পারল কেমন যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে গুহাটা। কেমন যেন হালকা হয়ে ভেসে উঠছে দেহটা। চারদিকে এখন তীরের মতো আলো ছুটেছে। আলো আলো, এত আলো চামড়া চুঁইয়ে বুকে লাগছে।

অবশেষে চোখ মেলেই চাইল নিত্যানন্দ। ভীষণ আলোয় চোখের পাতা ঝলসে যাচ্ছে। আলোর ধাঁধা চোখের পাতায় কাটিয়ে নিতে নিতে বুঝতে পারল ডাঙার উপরই ও শুয়ে আছে। কিন্তু আশে পাশে কেউ নেই। বিভু মতি কলকি বেণী কেউ নেই। গেল কোথায়!

ঝিনঝিন করে মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে।

শক্ত ভাবে দু-হাত দিয়ে মাটি চেপে ধরল নিত্যানন্দ। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, মতি বেণী বিভু কলকি ওরাও বুঝি এক একটা সুরঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ পাঁচজনে আবার এক না হলে নৌকোখানার কি হবে!

নিত্যানন্দ আবার কেমন তলিয়ে যেতে লাগল অন্ধকারে। অথচ যাতে না যায় এবার তারই চেষ্টা করতে হাত ছড়িয়ে মাটি ধরল।

ছন্দ

চার্লস চ্যাপলিন

কেবলমাত্র ভোরের আলো এই ছোট্ট স্প্যানিশ জেলের প্রাঙ্গণের নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিল—ভোর, মৃত্যুর বার্তাবাহী—তরুণ লয়্যালিস্ট তখন দাঁড়িয়ে আছে বধ্যভূমিতে, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। প্রাথমিক কাজকর্ম শেষ। অফিসারদের ছোট্ট দলটি এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুদণ্ড দেখবার জন্য। এই মুহূর্তেই সমস্ত দৃশ্যটিকে এক করুণ স্তব্ধতায় ছেয়ে দিলো।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা আশা করেছিল স্টাফ-অফিসার মৃত্যুদণ্ড স্থগিতের আদেশ পাঠাবেন। দণ্ডিত মানুষটি তাদের আদর্শের বিরোধী, কিন্তু স্পেনে সে ছিল জনপ্রিয়। একজন চমৎকার ব্যঙ্গরসিক ছিল সে, তার লেখা সহকর্মীদের মনকে অনেকখানি আনন্দে উৎফুল্ল করত। ফায়ারিং স্কোয়াডের অফিসার-ইন-কম্যাণ্ড তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। গৃহযুদ্ধের আগে ওরা ছিল বন্ধু। মাদ্রিদ য়ুনিভার্সিটি থেকে ওরা দুজন এক সঙ্গেই ডিপ্লোমা পেয়েছিল। ওরা একসঙ্গেই রাজতন্ত্র ও গীর্জার ক্ষমতা উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করেছে। একই সঙ্গে তারা মদ খেয়েছে, কাফেতে রাত কাটিয়েছে বিভিন্ন টেবলে, হেসেছে, পরিহাস বিনিময় করেছে এবং সারাটা সন্ধ্যা ভরে দিয়েছে নানারকম অধ্যাত্ম কূট-তর্কে। অনেক সময় তারা বিভিন্ন ধরণের সরকার সম্পর্কে ঝগড়াও করেছে। তাদের মতবিরোধও ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই সারা স্পেনে ডেকে আনল অশান্তি ও বিক্ষোভ। তারাই এখন তার বন্ধুকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে কী লাভ? যুক্তি বিচারেরই বা কী দরকার? গৃহযুদ্ধ সুরু হবার পর যুক্তির আর কী প্রয়োজন আছে? নিস্তব্ধ জেল প্রাঙ্গণে অফিসারের মনে এ সমস্ত প্রশ্ন অতি দ্রুত ভীড় করে এলো। না। অতীতকে অবশ্যই ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। একমাত্র ভবিষ্যতই এখন বিচার্য। ভবিষ্যৎ? এমন একটি পৃথিবী যেখানে অনেক পুরনো বন্ধুকে আর দেখা যাবে না।

যুদ্ধ শুরু হবার পর এই একটি বিশেষ সকাল যখন তারা প্রথম আবার মিলল। কোনো কথা বলল না তারা। জেলের প্রাঙ্গণে ঢোকবার সময়ে তারা শুধু মৃদু হাসি বিনিময় করেছিল। এই করুণ সকাল জেলের দেওয়ালে রক্তিম আর রুপোলী আলো ছড়িয়ে দিল। সর্বত্রই একটা স্তব্ধতা, এমন প্রশান্তি যার ছন্দের সঙ্গে এই জেল প্রাঙ্গণের ছন্দ একসূত্রে গেঁথে গেছে, এমন নিঃশব্দ দুরুদুরুনির ছন্দ যা বুকের স্পন্দনের মতো। এই নৈঃশব্দের মধ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডের অফিসার-কমাণ্ডিং-এর কণ্ঠে জেলের প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হলো : "এ্যাটেনশন !"

এই আদেশ শুনে ছ-জন সাবর্ডিনেট বন্দুক চেপে ধরল, তাদের শরীর কঠোর হয়ে গেল। তাদের এই একই তালে চলার পর খানিকটা চুপচাপ। দ্বিতীয় আদেশ এসময়েই আসার কথা।

কিন্তু এই বিরতির সময়ে একটা কিছু ঘটল, যা ছন্দপতন ঘটাল। দণ্ডিত মানুষটি কাশল, গলাটা পরিষ্কার করে নিল। এই বাধা সমস্ত ঘটনার পারম্পর্যকে অদল-বদল করে দিল।

অফিসারটি ফিরে তাকালেন বন্দীর দিকে। সে কথা বলবে বলে প্রতীক্ষা করছিলেন তিনি। কিন্তু কোনো কথা সে বলল না। আবার নিজের সৈনিকদের দিকে ফিরে তিনি দ্বিতীয় আদেশ দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু হঠাৎ তার মনে কী একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো, স্মৃতিলোপ হয়ে তার মস্তিষ্ককে শূন্য করে দিল।

তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সৈনিকদের সামনে। কী ঘটছিল? জেলপ্রাঙ্গণের এই দৃশ্য তাঁর কাছে কিছুই মনে হলো না। তিনি আর কিছুই দেখলেন না, বাস্তবদৃষ্টিতে শুধু একটি মানুষ দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে, সামনে ছয়জন মানুষ এবং পাশে দাঁড়ানো এই লোকগুলোকে কী বোকা দেখাচ্ছিল, যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ির মতো। কেউ নড়ছে না। কোনো কিছুরই কোনো মানে নেই। একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে। এ সমস্তই একটা স্বপ্ন। অফিসারটিকে এর থেকে পালাতে হবে।

অস্পষ্টভাবে ক্রমশ তাঁর স্মৃতিশক্তি ফিরে এলো। কতক্ষণ ধরে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে? কী হয়েছে? ওহো! তিনি তো একটা অর্ডার দিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অর্ডারটি কী?

"এ্যাটেনশন !" বলবার পর "সোল্ডার আর্মস্" তারপর "প্রেজেন্ট !" এবং

সবার শেষে "ফায়ার !" তাঁর অবচেতনে এ সম্পর্কে অস্পষ্ট একটা ধারণা ছিল। কিন্তু যে কথাগুলো উচ্চারণ করতে হবে সেগুলোকে মনে হতে লাগল অনেক দূরের, অস্পষ্ট এবং তাঁর মনের বাইরেকার।

এই বিব্রত অবস্থায় তিনি অসংলগ্নভাবে কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করলেন যার কোনো মানে ছিল না। কিন্তু তিনি দেখে আশ্বস্ত হলেন যে তাঁর সৈনিকরা কাঁধে বন্দুক তুলেছে। তাদের নড়াচড়ার ছন্দ তাঁর মস্তিষ্কের ছন্দ আবার জাগিয়ে তুলল। আবার, তিনি হাঁক দিলেন। সৈনিকরা বন্দুক বাগিয়ে ধরল।

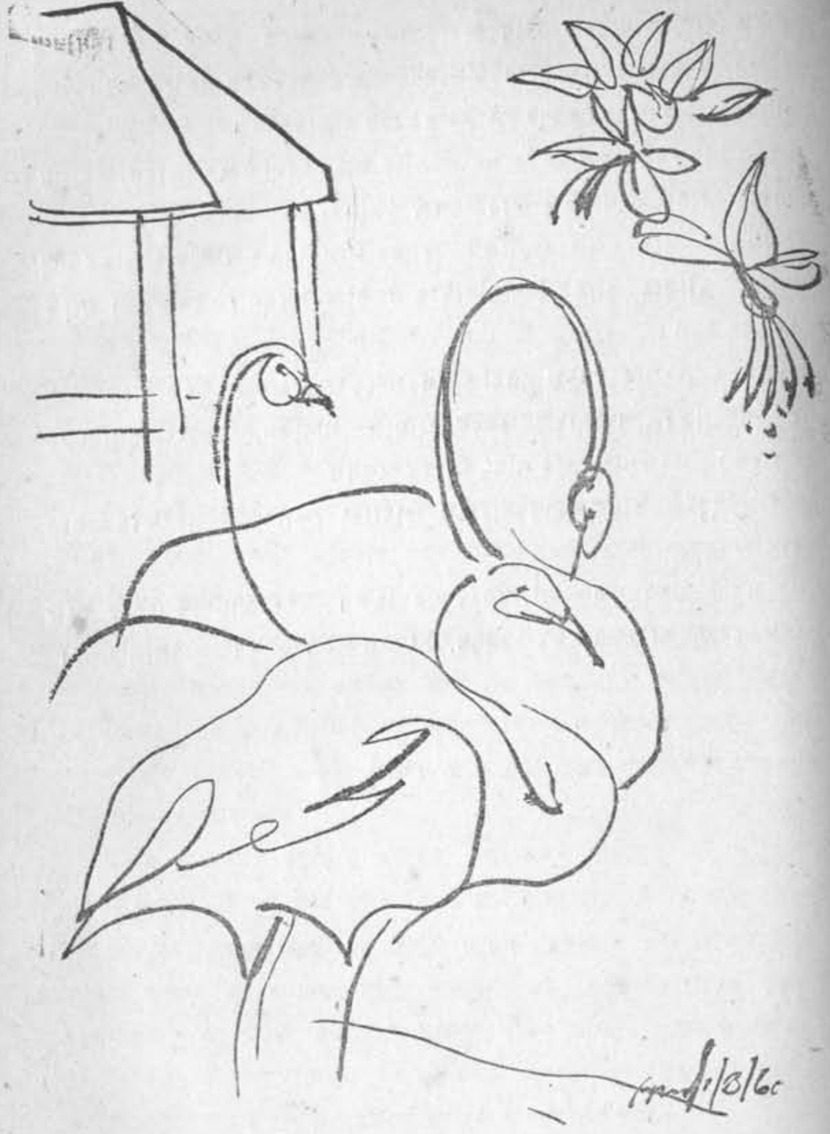
কিন্তু এরপরে যেটুকু বিরতি সে সময়ে জেলপ্রাঙ্গণে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। অফিসারটি তখনই জানতে পারলেন, মৃত্যুদণ্ড স্থগিতের আদেশ। তৎক্ষণাৎ তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

"স্টপ্ !" তিনি প্রাণপণশক্তিতে ফায়ারিং স্কোয়াডকে চিৎকার করে বললেন।

ছয়টি মানুষ বন্দুক বাগিয়ে তৈরি ছিল। ছয়টি মানুষকে একটি ছন্দে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ছয়টি মানুষ, চিৎকার শুনল "স্টপ্ !" চালাল গুলী।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ে লেখা

অনুবাদ : কৃষ্ণ ধর



স্কেচ গোপাল ঘোষ

দুটি কবিতা

বিষ্ণু দে

জল কন্যা নয়, তবু অনন্ত অগাধ
অতলান্ত সমুদ্রেই আমি করি বাস।
বর্ষা শুধু বর্ষে বর্ষে আমারই সম্বল,
অন্যদের আছে বারো মাস।

না, তা নয়, দায়ী নয় কোনো অপরাধ,
আমার বা আর কারো দোষ।
তাকে জানি—এই সত্য একান্ত সরল।
আশ্চর্য যা, তা হলো যে নেই আফশোষ॥

কোনো যুক্তি নেই। তবে যুক্তিতে কে বাঁচে!
যুক্তির সেই তো মহাত্রুটি।
সেকেলে ভাগ্যের মতো যুক্তিরও ভ্রূকুটি।
যুক্তির প্রসাদ কেবা পুঁথি ঘেঁটে যাচে!

হয়তো বা যুক্তি নেই, শক্তি খুবই কাঁচা,
ইওরোপীয় নয় সত্য, হয়তো জান্তব—
তবু বাঁচে! বস্তিতে বা ফুটপাথেই অজ্ঞাত কী বাঁচা!
এক হিসাবে মনে হয় এরা সব বিশ্বের পাণ্ডব॥

ঝাঁপিটা কাল খোলা হবে

অরুণ মিত্র

ঝাঁপিটা কাল খোলা হবে, চলো এখন শহর দেখিগে। ধুলো, লাল নীল কাঁচের টুকরো, ভাঙা পেতল, আঁটি—ও সবের চেয়ে কম আশ্চর্য নয় এই দিনের বেলার শহর। ও গুলো ঢাকা থাক, আমরা পথে ঘাটে ঘুরে আসি। কে জানে এমন কিছু হয়তো পেয়ে যাব যা কস্মিনকালেও পাইনি।

এই কথার পর ঘুণ-ধরা হুড়কোটা নামিয়ে আমরা বেরোই।

বাস্তবিক তাক লাগাবার মতো শহর। সত্যিকার মায়াপুরী। এক এক জায়গায় রোদ জ'মে জ'মে যেন স্ফটিক হয়েছে। তা দিয়ে কতগুলো গৌরবের স্তম্ভ তোলা যেতে পারে ভাবি। অনেক চীৎকারের এক বিশাল প্রপাতের সামনে গিয়ে পড়ি। সেখানে আমরা কোনো কথা বললে তা আর আমাদের থাকে না, কিছুতেই থাকে না। শহরের মাঝখানে দেখি রাবণের চিতার মতো আগুনে আকাশ টকটকে। আমাদের সব উত্তাপ বুঝি ঐ কেন্দ্রে জমা থাকে। অথচ এক কোণে, অনুমান করি, কোনো গাছ মৌমাছির ঝাঁক নিয়ে নম্র হ'য়ে আছে। তাকে দেখতে পাই না বটে, কিন্তু কাছাকাছি অনবরত মগ্ন গুঞ্জন। এবং মনে হয় সূর্যের ভিতরে মধু জমছে।

কতক্ষণ ধ'রে কত অলিগলি রাস্তা পার হ'য়ে হঠাৎ বিরাট মোড়। সেখান থেকে শুধু আমাদের বাড়ির পথটাই চিহ্ন দেওয়া। আর সব দিক অপার সমুদ্রের মতো।

খালি হাতে ফেরার সময় আবছা হাওয়ায় ঘেরা ঘুম-জড়ানো একটা কচি গলা আমার কানের কাছে বলে, ব'লেই চলে: "কাল যখন ঝাঁপি খোলা হবে, দেখো না কি মজা হয়…কাল যখন ঝাঁপি…"

বিপরীত ছবি

মণীন্দ্র রায়

সবাই সোহম্ হবে এই স্বপ্নে বসে শবাসনে।
ব্যাকুল নিষেধ যত, স্বেদ, ক্লেদ, সমস্ত বিকার
কেউ কেউ পার হয়; কারো কারো জীবনমন্থনে
দেখা দেয় নীল জ্যোৎস্না, পূর্ণতায় স্নিগ্ধ পূর্ণিমার।
তারাই সার্থক, বৃত; তাদেরই উদার বরাভয়
আনে কামনার শস্য; জন্ম-জন্ম যুগলে-যুগলে
শুষ্কতার এ সংসারে রোধ করে যত ভূমিক্ষয়
সে শুধু তাদেরই টানে উদ্বেলিত জোয়ারের জলে।

আমারও সাধনা তাই; কিন্তু আমি বুকের ভিতরে
কোনো পূর্ণিমার আলো পাইনি প্রবল আবির্ভাবে।
তবু এই না-থাকাও সর্বব্যাপী তৃষ্ণার শিখরে
ভীষণ মন্ত্রের মতো অমাবস্যা হ'য়ে আজ কাঁপে।
কান পাতো সে আঁধারে; দেখ সেই বিপরীত ছবি ঃ
শূন্যেরও কোটাল-বানে ভেসে যায় জীবনজাহ্নবী!

সময়চিত্র

চিত্ত ঘোষ

যে সব বন্ধুর সাথে প্রতিদিন দেখা হতো আগে
এখন তাদের ছায়া দূরবর্তী যাদুঘরে যাওয়ার রাস্তায়।
চোখের পাতার রঙে, মুখের মণ্ডলে অঙ্কিত জটিল দাগ :
"যেখানে ছিলাম আগে, যে রাস্তায়, যে বাড়িতে ঘরে
এখন সেখানে নেই" !
"এখন যেখানে আছি, যে রাস্তায়, যে বাড়িতে ঘরে
ধাবিত, আহত, নিত্য…"
অন্ধকারে প্রবল গম্ভীর শব্দ অতিকায় গাছ থেকে পড়ে
ছড়ায় রোদন প্রতিধ্বনি।
নদীর অতল স্রোতে নৌকোর নিভৃত শব্দ শুনি
"অদৃশ্য পাথারে • যাই
ভেসে যাই নীলরেখা দূরত্বের দিকে—"
চায়ের টেবিলে এক চুম্বক ধাতুর টান :
দুদিকে দুজনে বসে, চারদিকে চারজনে,
অসংখ্য বিকেল, গল্প, ক্লিষ্ট মুখ
আহত উজ্জ্বল রাত্রি, আলোড়ন, অন্ধকার স্থির।
কখনো ভীষণ বিদ্ধ কঠিন পাথরে।
সেখানে যাওয়ার দিকে উচ্চ চূড়া পিচ্ছিল পাহাড়
অথবা এখানে ভবিতব্য অমোঘ সংলাপ।
প্রয়াসে.কী প্রতীক্ষায়, বোধবৃত্তি ব্যবহারে
আদিম উদ্যম ইচ্ছা নিয়োজিত করা।
মূলকেন্দ্রে শরবিদ্ধ পাখি
আমাদের সারা গায়ে তার রক্ত, তার অশ্রু তারি শুভ্র শীতল পালক।

চৈত্রের চাতক বলেছিল

সিদ্ধেশ্বর সেন

১

চৈত্রের চাতক বলেছিল, "ফটিক জল"
স্ফটিক
জল

জিহ্বা, আল্-
জিহ্বা গিয়ে ঠেকে
ব্রহ্মাণ্ডতালুতে
শুকনো ও খট্‌খটে, শুকনো ও
খট্‌খটে

জরাবন্ধ্যাত্ব এক অকালদ্বিপ্রহর মাথায়
জলন্তপ্রপঞ্চ নিয়ে যায়, হেঁটে

বৃদ্ধ, হে যুবার সাজ, কতবার বিভিন্ন
সংকেতে
কিম্বা ও কে, রূপান্তরে সনাতন
ও নবীন

চৈত্রের তিমির বেলাবিপুলমধ্যাহ্ন, কাল-
বৈশাখে, মুকুর-
সর্বনাশে
কাঁটায় গাজনেগাছে, সংক্রান্তির
চড়ক-সঙীন ॥

২

চৈত্রের চাতক চেয়েছিল, স্ফটিক
জল

আমারই চরাচর ডোবে এক ফোঁটা তৃষ্ণার আকর
আকাশ, সে খচিত-স্ফটিক ?

৩

স্মৃতি, ও-বাজায় তার কালান্তর শিঙা
চৈত্রের ধূসর শব্দ হয়
হাওয়া এসে মুছে নেয় সমস্ত গরিমা

চৈত্রের ধূসরশব্দে, ধেনু
ফেরে, সূর্য
নামে, পাটে

আমাদের প্রেমঈর্ষাবিরূপতা, ভয়াবহ—
পরিণতি চায়

আমি এক পৃথিবীর অকথিত মাঠে

আমার কপাল থেকে দ্রুতআচম্বিত রেখাগুলি ধায়, শূন্যে
ঘটেপটে

পরিত্যক্ত আল, করোটি ও হাড়

অস্তিম, অস্তিম-বৃত্ত উৎ-
ক্ষিপ্ত, ও আবৃত
ধূলায়

যচ্ছেদ বাঙ্ মনসী
উড়ন্ত সে বাক্, উড়ন্ত, উড়ন্ত
প্রাজ্ঞস্তদ যচ্ছেজ্
জ্ঞান আত্মনি
ওড়ে আঁধার, মৌল-বিলাপ
আযোজন
রাশিরাশি কল্প ও নিমেষ পুঞ্জব্যেপে, ওড়ে
নক্ষত্রেস্ফটিকে, হাহাকার ॥

জন্ম-মৃত্যু, এই প্রজনন

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

মুখে বমনের গন্ধ, সারাদেহে কলঙ্কের দাগ—
কী করে দাঁড়াব তার কাছে ?
আমার এ ঘৃণ্য পশুটাকে
আমি যত ঘৃণা করি, তত ঘৃণা মানুষে করে না ;
সমগ্র অস্তিত্ব তার ভূতগ্রস্ত বিকারের ঘোরে
ইতর সুখের এক গোপন বিবর ছাড়া আর কিছু জানে নি, জানে না।

এই দিয়ে ছোঁয়া যায় ধ্রুবতারকার দীপ্তি—প্রেম ?
অনুভব করা যায় কুমারীর মনের আহ্লাদ
হৃদয় ছাপিয়ে ওঠে স্বর্গীয় যে-দানে ?
যত স্বপ্ন-সাধ
কঠিন শায়ক-বেঁধা তীর্থগামী বলাকার মতো
চক্রবালে পাক খেয়ে মুখ গুঁজে মাটিতে লুটায়।
চোখে তার টলোমলো পদ্ম জাগে মানস-হ্রদের
যূথভ্রষ্ট বেদনায় নীল ;
রক্তাক্ত ব্যাদিত মুখে আমি বন্য কুকুরের মতো
ছেঁড়া পালকের ভাঁজে কোমল মাংসের স্বাদে মজে
স্বর্গের দোরের কাছে বেত্রাহত, আর্ত চেয়ে আছি !
আমি আর সেই পাখি
দুজনেরই দীর্ণ বুকে নষ্ট-নীড় স্মৃতি।

ভোরের আশ্চর্য লগ্নে কখন যে ফোটে পারিজাত—
ফুল-পাখি-পতঙ্গেরা সারিবদ্ধ, প্রথম অগ্নির
বন্দনায় নতজানু ; অন্য এক জন্মের প্রস্তুতি
প্রত্যহের পুরানো এ পৃথিবীকে করে গর্ভবতী

ঘোমটার ধনুকে-টানা পিঠ তার নতুন মায়ের
লজ্জায় কখন কাঁপে!—ভাব দূর স্মৃতি!
বৈশাখের পুণ্য ফুল, সহোদরা অমল নীলিমা,
মাঠের সবুজে ক্ষত-বিক্ষত এ হৃদয় বিছিয়ে
বারবার বলি তাই, "শুদ্ধ করো, শুদ্ধ করে নাও"—
জাতক-লগ্নের সেই পবিত্র অগ্নির
স্পর্শ দাও আমার কপালে;
দাও সেই পাখা দাও, স্বর্ণবর্ণ বিহঙ্গ-যমজ,
হে উড্ডীন, হে আকাশচারী!

আমার প্রার্থনা যত নিরুত্তর দেওয়ালে দেওয়ালে
প্রতিহত হয়ে ফেরে; নিজেকে নিজেরি ছায়া যেন
হাত ধরে নিয়ে যায় সন্ধ্যার বীভৎস গলিপথে
মাদক-উল্লাসে যেন নরকের সব কটি দ্বার
সেখানে কে দেয় খুলে; নগ্ন-দেহে হুমড়ি খায় মাংসলুব্ধ একদল পশু,
হয়তো মানুষ ছিল গত জন্মে—আজ তার ছায়া।
স্খলিত গলায় তীব্র হেঁকে উঠি—"আমাকে ফেরাও,
নরক কী বীভৎসতর এ পঙ্কিল শহরের চেয়ে?"
হেসেছে এ প্রশ্ন শুনে ছায়ামূর্তি প্রেত অনুচর।

আবর্ত-কুটিল ক্ষিপ্ত ভোগবতী পাতালের নদী,
তোমার গভীরে আমি মজ্জমান হয়ে যেতে যেতে
প্রাণপণে হাত তুলে শুদ্ধ সেই প্রথম অগ্নিকে
জন্ম-শোধ একবার স্পর্শ করে যাব।

মারীচ

মৃগাঙ্ক রায়

আমার প্রত্যয়ে প্রবেশ ক'রো না।
বৃষ্টি, বৃষপাল মেঘ, মরুভূমির রাবণ
রৌদ্র, স্বেদ, ঘুরে ঘুরে
ফের ঘুরবে—বহু শব্দ, শব্দহীনতা
ক্লেদ, দুয়ারের দৃঢ় অন্ধকার।
আমি আমার বাইরে থাকব
তুমি আসবে অনুমানে।

অথবা তুমি অযোধ্যা নগরে যাও
কিংবা ইন্দ্রপ্রস্থে সুস্থির সমাহৃত নাগরিক।
যাও যার প্রতীতির অলীক শুভ্রতা রাজহংস
নির্লিপ্ত নদীতে, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পুরুষ কোনো
বেছে নাও—যার ঘরে অহংকারের উদ্ধত ভ্রূ
মানবে নিশ্চিত, যার বাহুর স্পর্ধার নিচে
উলঙ্গ-সুভদ্রা ভয়ংকর বিস্ফারিত।

আমার প্রত্যয়ে প্রবেশ ক'রো না।
আমি শরীরে রাক্ষস রেখে মারীচের মতো
মায়াবী হরিণ।

পাঠক-প্রতিমের প্রতি

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

মধ্যাহ্ন অলস কৌচে, জানালায় জটিল রোদ্দুর :
স্ফুলিঙ্গে অনলকাণ্ড, ঢেউ বিনা কোথা সমুদ্দুর !
অবশিষ্ট পুরোডাশে শেষাহুতি, প্রস্তুত ঋত্বিক ।
লাঞ্ছনা সহে না আর, বিজ্ঞজন পাড়ে শত ধিক্ !

নগরে উজ্জ্বল রূপা : অধ্যাপক, কবি ও বণিক ;
সুউচ্চ কল্পনা গড়ে নীলাকাশে, দম্ভে নীল মেঘ ।
সহস্র উন্মুক্ত মুষ্টি, রাশি রাশি করুণা ; অধিক
চাহিনা পাঠক ! ক্ষমা মাগি, ও-প্রজ্ঞায় অনাবেগ !

সম্ভ্রম প্রমাদদুষ্ট, কামদুষ্ট রমণী যেমতি
আপন ইচ্ছায় সাজে যেমন সাজায় অপরাহ্ণ :
মদ্যে দাহ কিন্তু প্রিয়, ভাঁড়ামিতে অসতীই সতী ।
ইচ্ছা হয় ঘর বাঁধি, গন্ধে পাই যথার্থ নবান্ন ।

জানি শেষে ক্ষমা নেই, নেই সেই আলোক উদ্ধার !
ত্রুটিপূর্ণ সব শ্লোক, মেনে নেয় বিনম্র মুদ্রক ।
বর্ষ রহে নিরুদ্বিগ্ন, অন্যদিক শূন্য, অনাহার ।
যাহোক তবুও বাঁচে রক্তেমেদে, সচ্ছল শূদ্রক !

বক্তব্যে অক্ষমস্তুতি, পাশাপাশি কে আছে, নিঃসীম !
সব কথা নিরর্থক, হাসো নাকি পাঠক-প্রতিম !

অগ্নিপটে, দ্বৈপায়ন

তরুণ সান্যাল

না, দেখিনি আয়ুরেখা করতলে কভু, তবু আমি
বহুদিন বাঁচতে চাই, শরীরী, বিনীত, অহঙ্কারী,
স্বগৃহের ইন্দ্রপ্রস্থে হতে চাই প্রিয় গৃহস্বামী—
পাশাপাশি বৃদ্ধা হোক আমার সন্তানসহ, নারী ।
চিন্তার মধ্যাহ্নে আছি এবম্বিধ, নির্জন গোলুই,
কেবল জলের শব্দ ছলাৎছল বক্ষমূলে রক্তে,
ক্বচিৎ প্রপাতে যেন সদা শিব তৃষ্ণ বৃদ্ধে ছুঁই—
(কুঁড়ির যৌবন, তুমি ছিলে কবে, কাকে মনে ক'রে ।)

বিকেলে ট্রামের জানলা ঠেলে নামা চোখের দর্পণে
কিছু মগ্ন মুখ যায়, সমাহিত, আকাঙ্ক্ষা কাহার
দোমড়ায় বিদ্যুতে নীলে রক্তিম তামায়, কে তর্পণে
আপন জান্থর কেন্দ্রে কৃশাণু ও ভাস্বর আহার
হয়ে যায় ব'লে একা অগ্নিঘেরে আয়ুর বহরে
দ্রুত মজ্জমান হয়, শৈলীহীন, পায়ে কে বকুল
ছুঁড়ে দিলে চৌমাথায়, হে অতনু, কোন ধুলা ঝড়ে
নগ্ন প্রহেলিকা হয় কৈশোরের চাঁপা, বেলফুল ?

কখনও দেখিনি আমি আয়ুরেখা নগ্ন করতলে,
অধুনা বায়ুর সাক্ষ্য হাতের চাতালে মাথে ধোঁয়া—
বাংলা দেশ, হে জননী, ধুয়ে লোনা জলের অতলে
অক্ষিপট, ঘুমে রও, কদাচিৎ স্ফুরিত জড়োয়া
রক্তিম তরঙ্গে ফুটে যায়, ভেসে যায় গৃহস্থালি—
আর দ্বৈপায়ন ভঙ্গে রই নিকেতনে স্বইচ্ছায়
ত্রস্ত দেখি, বিসর্জনে চলে তব প্রতিমার চালি
অনভিপ্রেত হে সুখ কার অশ্রু উল্কামুখী ধায় !

চতুর্দিকে অগ্নিযজ্ঞ, যজ্ঞগৃহ শীতলে, সন্ন্যাসে
মুষলগর্ভিনী স্বপ্ন শুয়ে আছে সমিধসঙ্কাশে ॥

একাকী যাব না পথে

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কেউ স্পষ্ট কাছে থাকে। কেউ ম্লান দূরত্বের দ্বারে
শব্দহীন ফিরে যায়। অস্তাচল গ্রীবার শাসনে
ভালোবাসা নত দেহ। সহৃদয় কর্তব্য পালনে
প্রান্তরে পুষ্পের শোভা প্রাত্যহিক আলোর উদ্ধারে।

ঊর্ধ্বে গ্যাখো আলোহীন ঝরে যাচ্ছে বিগত আকাশ।
কয়েকটি প্রাচীন চিত্র পৃথিবীর ব্যবহৃত পথে
বার বার দৃশ্য হয়। বহু মুখ মিলন দ্বৈরথে
তৃপ্তিহীন। চ্যুত রৌদ্রে প্রতিবিম্ব কার প্রতিভায ?

প্রভাত আপাত রম্য। ক্ষমাহীন দুঃখ চতুর্দিক।
পতঙ্গ ভীষণ ব্যর্থ অঙ্গে নিতে অগ্নিশিখা দাহ
ভুলতে পারিনা ম্লান উচ্চারিত মুখের প্রবাহ।
জটিল জানলা খুললে সমস্তই মুখের প্রতীক।

একাকী যাব না পথে। বহুজন পরিবৃত সুখ।
কণ্টকে বিক্ষত দেহ প্রতিবিম্বে যুগ্মতা দেখুক ॥

অংশু অস্তাচল মূলে

রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

তাকে আমি কখনো দেখিনি ; তার চৈত্রবনে জ্যোৎস্নাগুলি আজ
ফুটে আছে ; কিংবা কোনো দুপুরে হাওয়ায় দুলে শালবীথি···মৃদু একেশিয়া
তাহার বাড়ির বাইরে ডেকে আনে মাদলের মদির আওয়াজ।
এখন গিয়াছে ঘুমে···আরো ঘুমে মধ্যরাতে, দুখজাগানিয়া।

অয়শ্চক্রে দিন যায়, ঝরে ফুল···ঝরে গ্রীষ্মে প্রদোষবেলায়
চোখের উপরে দেখি ঋতুগুলি ভেসে যায়, ঋতুগুলি বছরে-বছরে—
এসেছিলে তবু আসো নাই জানি, পলাতকা ছায়ার খেলায় ;
শীতের মর্মরে যায়—বাঙলার হেমন্তের পাতাগুলি, পাতার মর্মরে।

সকলে মিলিত আছি আমরা এই জীবিকাজীবনে নষ্টদশকের দাহে
কিংবা শতবর্ষে···স্মৃতিফলকের পাশে শুনি কলকাতার আত্মঘাতী গান,
জাগরণে দীর্ঘ শোক লেগে আছে বিরক্ত ট্রাফিকে, পায়ে-পায়ে ,
বন্ধুদের চোখে নগ্ন, বিস্ফারিত নগরীর শাণিত শ্মশান।

এখনো অদূর, উর্ধ্বে উড়িছে মরাল এক নীলিমায়···সৌর অবগাহে
বুকের ভিতরে যার চিহ্নগুলি—আমাদের উৎসবের অতল আহ্বান।

ছায়াচ্ছন্ন পশ্চাতের পানে

শিবশম্ভু পাল

ওরা যে বধির করে গর্জমান দুঃস্বপ্ন অকূল,
সম্মুখে কেবল দেখি আবছায়া দিবসরজনী ;
এ পথে নিয়ত চলি, ইচ্ছা কি অনিচ্ছা কিছু বুঝি না জানি না।

পিছনে দুহাত তুলে কে ডাকছে ? দিগন্তরেখাটি।
সে যে আত্মহারা ছিল রক্তের রণনে সে যে কতযুগ আগে,
সে যে বড় মায়াময় নায়িকার অনুপ ভ্রূলেখা···

জানে না কুয়াশা কত অনিশ্চয় অনিবার্য কত,
অদৃষ্টের মতো টানে পতনে কাঁটায় অবলোপে
অথবা বাতাসহীন সোনার নরককুণ্ডে আমিও জানি না।

গোধূলির স্বর্ণে কিম্বা বাদলের প্রথম কদম
ফুলের সলজ্জ দলে যে ভাষা ফোটালে তুমি, হে দিগন্তরেখা,
তার শব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে, আমি

চলে যাই, যেতে হয়, দূরে, সামনে আবছায়া দিবসরজনী
পিছনে তুমিও ক্রমে বিস্মরণ, স্তব্ধ, মৌন, আর
শ্রুতিরে আঘাত করে গর্জমান দুঃস্বপ্ন অকূল।

এবং এখনো চোখ চলে যায় ছায়াচ্ছন্ন পশ্চাতের পানে।

বিপিনচন্দ্র পাল : ভারতচিন্তায় ভক্তিমার্গ ও যুক্তিমার্গ

সরোজ আচার্য

বিপিনচন্দ্র পালের জীবন ও চিন্তাধারার মধ্যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মিশ্র বা স্ববিরোধী রূপটিই পরিস্ফুট। জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টি হবার মাত্র কয়েক বৎসর আগে যেমন তাঁর কর্মজীবন শুরু তেমনি এই নবজাগ্রত জাতির আত্মসন্ধিৎসার মতোই বিচিত্র ও ব্যাপক ছিল তাঁর বহুমুখী অভিনিবেশ। নব্যভারতের জাতীয় উন্মেষ অবশ্য পুরোপুরি অতীতের পুনরুজ্জীবন বা পুনরাবিষ্কৃতি নয়, তা হওয়া সম্ভবও ছিল না। তবু ভারতের রেনেসাঁসের মধ্যে প্রথম থেকেই যে যুক্তিবাদ ও পুনরুজ্জীবনবাদের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ বা সহ-অবস্থান ঘটেছিল তা স্বীকার্য। এই কারণেই প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া, বিদ্রোহ ও রক্ষণশীলতার প্রতিযোগী এবং পরস্পরবিরোধী প্রবণতার জোয়ার ভাটায় নবোদ্ভিন্ন ভারতীয় মানস দ্বন্দ্বমুখর। বিপিনচন্দ্র পালের জীবন ও চিন্তাধারার মধ্যে আমরা যে জটিলতা, এমন কি স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করি সেও এই কারণেই।

তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময়জীবনে বিপিনচন্দ্র ছিলেন এক অন্তহীন আত্মজিজ্ঞাসু, তাঁর এই আত্মজিজ্ঞাসা ছিল নানা সুরে বাঁধা নানা পরস্পরবিরোধী স্তরে বিস্তৃত। কিন্তু সেজন্য তাঁকে কপট বা নিষ্ঠাহীন বলে অভিযুক্ত করা চলে না। তাঁর আরও অনেক সহযোগীর মতো বিপিনচন্দ্রের মধ্যেও হয়তো কিছুটা দ্বন্দ্বপ্রিয়তা বা একগুঁয়েমী ছিল, কিন্তু তাঁর মধ্যে স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদের লেশমাত্র ছিল না। বিকাশোন্মুখ জাতীয় চেতনার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্যেই স্ববিরোধী অস্তিত্ব ছিল। অতএব স্বভাবতই বিপিনচন্দ্রের সত্তর বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনের অতৃপ্ত ও অন্তহীন বুদ্ধিগ্রাহী জিজ্ঞাসা তাঁকে পর্যায়ক্রমে চরম ও নরমপন্থী, বিপ্লবী ও নিয়মতন্ত্রী, যুক্তিবাদী ও পুনরুজ্জীবনবাদী হিসাবে উপস্থিত করেছে।

প্রবল জ্ঞানস্পৃহা এবং অদম্য আত্মপ্রকাশের আবেগ নিয়ে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই বিপিনচন্দ্র দীর্ঘ বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন। তাঁর

জীবন ছিল দীর্ঘ এবং একই সঙ্গে নানা স্তরে বিস্তৃত। সহজাত আবেগ প্রবণতা ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির অধিকারী হওয়ায় তাঁকে বারংবার পরস্পর বিরোধী পন্থা পরিক্রমণ করতে হয়েছে, ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে জ্বালাময়ী বিতর্কে। সবাইকে যেমন চমক লাগিয়ে দিয়েছেন, তেমনি বিভ্রান্তও করেছেন। শেষপর্যন্ত তিনি যে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন আমাদের মনে তা হচ্ছে নানা বৈপরীত্য সত্ত্বেও একটি সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের ; তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারা আধুনিক ভারতের ইতিহাসে নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই মানুষটির বহুমুখী প্রতিভা বহুবৎসর পার হয়ে সেই বিগত যুগের আবেগ ও বহুধা কর্মোদ্যমের সাক্ষ্য আমাদের কাছে বহন করে আনে।

এই শতকের সূচনায় বিপিনচন্দ্র যখন তিলক ও লজপৎ রায়ের পাশে নিজের আসন করে নিলেন তখন 'লাল-বাল-পাল' এই ত্রয়ীই হলেন রাজনৈতিক চরমপন্থার উজ্জ্বল প্রতীক। এরই জাদুমন্ত্রে তখন অগণিত শিক্ষিত নরনারী হয়ে উঠেছিল উদ্বেলিত। এক মহান বাঙালী, এক মহান পাঞ্জাবী ও এক মহান মারাঠী এই ত্রয়ীর মিলনে গড়ে উঠেছিল ভাবগত ও বাস্তব জাতীয় ঐক্যসূত্র।

তাঁর অগ্নিস্রাবী বাগ্মিতার জন্য বিপিনচন্দ্র সহজেই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রবক্তা হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনি বাগ্মী ছিলেন কিন্তু তাঁর বাগ্মিতা বাগাড়ম্বরসর্বস্ব ছিল না। ১৯০৭-৮ সালে তিনিই সর্বপ্রথম স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতার বাস্তব তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। সূচিত হলো আবেদন নিবেদনের ও ঠিকাদারী রাজনীতির উপসংহার। তাছাড়া পরবর্তী কালের বিপ্লবী ভেকধারী জাতীয় নেতাদের বহু আগেই বিপিনচন্দ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের স্থলে বাদামী বা দেশী আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি জানিয়েছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজী আবির্ভূত হবার অনেক আগে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সেই সর্বপ্রথম এই বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী সাহসের সঙ্গে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবার কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন, "যে কোন শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াক না কেন, আমাদের ইচ্ছার কাছে তাকে নত হতে বাধ্য করাতে হবে।" বলা যায় বিপিনচন্দ্রের এই উক্তিই 'ভারত ছাড়ো' সূত্রের প্রথম ইশতাহার। তা সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে একটি বিরাট পরিহাস লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে গণ-আন্দোলন শুরু

হবার বহু বৎসর পূর্বেই বিপিনচন্দ্র গণ-সমর্থনের কথা বলেছিলেন এবং বিবেকের এক প্রশ্নে কারাবরণ করে অহিংস প্রতিরোধের প্রথম চমৎকার নির্ভীক দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছিলেন। আবার গান্ধীজীর নির্দেশে যখন সেই গণ-আন্দোলন ও অহিংস প্রতিরোধের আদর্শই ব্যাপকভাবে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলো, যেন বিপিনচন্দ্র পিছু হটলেন এবং হয়ে উঠলেন এই আন্দোলনের বিরোধী ও সমালোচক।

সংগ্রামের অবসান হয়েছে, বিতর্কের ধূলি সব থিতিয়ে গেছে, এখন হয়তো বোঝা সহজ হবে কেন, অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করবার গান্ধীবাদী কৌশলের অনমনীয় বিরোধিতায় বিপিনচন্দ্র হয়তো অতিরিক্ত গোঁড়ামির পরিচয় দিয়েছিলেন; কিন্তু অসহযোগ কর্মপন্থা নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল সেজন্য তাঁর দেশপ্রেম বা ব্যক্তিগত সততা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। নীতির জন্য নির্যাতন তিনি বীরত্বের সঙ্গেই সহ্য করেছেন। আর সেই নীতির জন্যই ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে যে ধারণা যুক্তিসিদ্ধ বলে তাঁর নিজের কাছে মনে হয়নি তার বিরোধিতা করতে তিনি একটুও পশ্চাৎপদ হননি।

বিশ সালের গণ-আন্দোলনের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের এই যে বিচ্ছেদ তাকে আপোস বা নীতি-বিসর্জন বলে চিহ্নিত করা হলে বিষয়টাকে খুবই ভাসা-ভাসা ভাবে দেখা হবে। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক কী তা সঠিক ভাবে বুঝতে হলে বিপিনচন্দ্রের সংগ্রামী প্রগতিবাদের মূল উৎস অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। তিলকের মতো বিপিনচন্দ্রেরও রাজনীতিই ছিল দ্বিতীয় প্রেম; দুজনেই ছিলেন বুদ্ধিজীবী; পরাধীন ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতি উভয়কেই অন্যক্ষেত্র থেকে অনিবার্য ভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে এনে মিলিয়েছিল, এবং উভয়ের কাছেই রাজনীতি ছিল জাতীয় পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত ভাব-আন্দোলনেরই একটি অঙ্গ।

তিলকের চিন্তাধারা ছিল প্রধানত ঐতিহ্যবাদী এবং ঐতিহ্যবাদী হিসাবেই তিনি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র প্রথম যৌবনে সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, এবং ঐ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন রাজনীতিতে। সামাজিক ও ধর্মীয় বিদ্রোহ থেকে রাজনৈতিক চরম পন্থায় পৌঁছতে তাঁকে বিশেষ কোনো প্রয়াস করতে হয় নি। কারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রচারিত

মুক্তির আদর্শ ইতিমধ্যেই জাতীয় রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বিপিনচন্দ্র ছিলেন প্রধানত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, সমাজসংস্কারক। কিন্তু বাংলাদেশে তখনকার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অনিবার্য স্রোত তাঁকে সক্রিয় রাজনীতির একেবারে পুরোভাগে এনে ফেলেছিল। তা সত্ত্বেও, তাঁর কর্মজীবনের পরবর্তী ধাপগুলি অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, চিন্তানায়ক বিপিনচন্দ্র কর্মবীর বিপিনচন্দ্রের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে তবুও উন্মাদনা সৃষ্টি করতো তার কারণ আদর্শকে দুর্নিবার আবেগে মণ্ডিত করবার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল; এবং এই কারণেই স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গের যুগে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা ভারতবর্ষের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত এতটা কার্যকরী হয়েছিল।

কিন্তু তাঁর মন ছিল নিরাসক্ত নৈতিক আদর্শবাদীর মন—তদুপরি কাব্য ও আবেগপ্রবণ বাঙালীর মন। সুতরাং গণরাজনীতির যৌথ ও নীরস কর্মপন্থার কাছে আত্মসমর্পণ তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না।

সক্রিয় রাজনীতি থেকে পশ্চাদপসরণ তাই তাঁর পক্ষে ভবিতব্য ছিল। তাঁর কর্মজীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যে পরস্পর বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল তা সম্ভবত তাঁর ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম বোধ থেকেই সঞ্জাত। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রী, ছিলেন নির্যাতিত ও অধঃপতিতদের দুঃখে কাতর মানবতাবাদী (তার প্রমাণ পাই চা-বাগানের শ্রমিকদের পক্ষে তাঁর লড়াই দেখে); কিন্তু জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পণের পপুলিষ্ট স্লোগানে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না বলেই মনে হয়। তিনি ছিলেন, যাকে বলা যায় মধ্য ভিক্টোরিয়া যুগের চরমপন্থী বুদ্ধিজীবী আর সেই কারণে গণ-রাজনীতির মূল দাবির চেয়ে ন্যায় বিচারের বিমূর্ত ধারণা দ্বারাই তিনি বেশি চালিত হতেন।

তাই বলে আজকালকার যে সব নেতা জনসাধারণের নামে শপথগ্রহণ করে থাকেন তাঁদের অনেকের মতো সচেতন অন্ধ শ্রেণীবিদ্বেষ বিপিনচন্দ্রের মধ্যে একটুও ছিল না। তাঁর সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের আদর্শগত প্রেরণা এসেছিল সামাজিক ও ধর্মীয় মুক্তি আন্দোলন থেকে; এর সঙ্গে কিছুটা এসে মিশেছিল তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধজাত আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অদম্য মনোভাবই তাঁকে শেষপর্যন্ত যুক্তিবাদ ও বিদ্রোহের

সার্বভৌম প্রবক্তা ও একক ঘাঁটি হিসাবে বাঁচিয়ে রেখেছিল। নতুবা রাজনীতিতে বা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে হোক না কেন তাঁর চরম পন্থা কখনোই ভীষণভাবে জ্যাকোবিন বা বলশেভিক ছিল না। বরং উদারনৈতিক মূল্যবোধের প্রতি এক ধরনের কোমল মনোভাবের পরিচয়ই তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে আধুনিকতা ও পুনরুজ্জীবনবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মান্ধতা এই দুটি পরিপূরক ও আপাত-বিরোধী ধারাই বিপিনচন্দ্রের কর্মজীবনের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। আবার ভারতীয় জাতীয় মানসের অন্যতম স্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতা হিসাবে বিপিনচন্দ্রের জীবন ও চিন্তাধারার সাম্প্রতিক তাৎপর্য রয়েছে কারণ এর মধ্যেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বর্তমান অভীষ্টসিদ্ধি ও প্রাক্তনপ্রয়াস উভয়েরই সীমাবদ্ধতা ও সাফল্য, দুর্বলতা ও শক্তির সূত্রগুলি নিহিত।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা প্রসঙ্গে

রবীন্দ্র মজুমদার

আমাদের আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা যেমন বিশিষ্ট, তেমনি অনন্য। সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলায় একটা সম্পূর্ণ নতুন রূপ-কল্পনার সূত্রপাত ঘটল রবীন্দ্রনাথের হাতে। কবির আঁকা এইসব ছবি কল্পনা আর রূপরীতির দিক থেকে এতই অভিনব আর অভূতপূর্ব যে এদেশের সাধারণ দর্শকরা তো বটেই, চিত্রকলারসিক সমঝদার ব্যক্তিরা পর্যন্ত গোড়ার দিকে একে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চান নি। তাঁরা এটাকে কবির শেষ জীবনের একটা খেয়াল আর শুধুই একটা নতুনতর সৃষ্টির খেলা বলে ধরে নিয়েছিলেন। আর, সাধারণ মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে যে একটা যুক্তিহীন বিরূপতা অন্তত সেই সময়ে দেখা যেত, তার মূলে অবশ্যই ছিল চিত্রকলা সম্পর্কে আমাদের শিক্ষাহীনতা। চিরাচরিতের বাইরে যে কোনো পদক্ষেপকে আমরা সন্দেহ করে বসি, অভিনবকে অদ্ভুত বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি যে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবনযোগ্য, সে কথা আমাদের দেশের চিত্রকলারসিকরা সম্ভবত উপলব্ধি করেন ১৯৩০ সালে যখন ইওরোপে—প্রধানত প্যারিসে—কবির চিত্রপ্রদর্শনী হবার পর সেখানে রীতিমতো একটা সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, নিজের আঁকা ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পসৃষ্টির এবং ছবি-আঁকাকালীন মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে যেসব ছোট প্রবন্ধ বা চিঠি লিখেছেন, আমাদের দেশের সাধারণ চিত্রদর্শকের মনের সংস্কার দূর করতে তা বিশেষ সাহায্য করে নি। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ওইসব রচনার মধ্যে যতটা কাব্য আছে, ততটা যুক্তি নেই। নিজের ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তা বেশ কিছুটা অ্যাব্স্ট্র্যাক্ট্ ধরনের। রবীন্দ্রনাথের ওইসব চিঠিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, গোড়ার দিকে তিনি ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন সত্যিই হালকা মনে, অবসর যাপনের কালে অন্য কোনো কাজে নিজেকে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে। পরে ক্রমশই তিনি ছবি আঁকার ব্যাপারে অনন্যমনা হয়ে উঠতে থাকেন,

লেখা বা গান রচনার মতোই ছবি আঁকাটাও হয়ে ওঠে তাঁর সৃজনভূমির একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। কিন্তু তবু, চিত্র রচনা করতে গিয়ে কবি যে নতুন শিল্পভাষা ব্যবহার করেছেন, সেই নতুন ভাষাকে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব তিনি নেন নি।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির এই নতুন ভাষাটি কি?

চিরাচরিত পদ্ধতিতে আঁকা ছবিতে দর্শক-সাধারণ সচরাচর একটা 'কাহিনী'র সন্ধান পান। অর্থাৎ, ছবির বিষয়বস্তুতে একটি 'গল্পবস্তু'—স্টোরি এলিমেন্ট—থাকা চাই। এই বাঁধা রীতি বা কন্‌ভেন্‌শনের বাইরে তখনকার তথাকথিত নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার প্রবর্তকরা যেতে চান নি। এবং আমাদের চিত্রকলারসিক ও চিত্রদর্শক-সাধারণ তখন ছিলেন এঁদেরই রচনার সঙ্গে পরিচিত, এঁদেরই রচনারীতিতে ও ভাবকল্পনায় অভ্যস্ত।

চিরাচরিত পদ্ধতিতে আঁকা ছবির যাঁরা রচয়িতা, তাঁরা সহজে দর্শকের কাছে পৌছনোর জন্যে প্রধানত নির্ভর করেছেন ছবির বক্তব্যবস্তুর ওপরেই। তাঁদের ছবিতে চিত্রগত মূল্য বা পিক্‌টোরিয়ল ভ্যালু গৌণ, কাহিনীগত ভাবাবেগ—লিটর‍্যারি সেন্টিমেন্ট—মুখ্য। এই যে কথকতাপ্রধান ন্যারেটিভ ছবি দেখতে আমাদের সাধারণ দর্শকরা অভ্যস্ত, এইসব ছবিতে দেখি বস্তুরূপের কোথাও বা স্টাইলাইজ্‌ড্‌ বা প্রথানুসারী প্রতিচিত্রণ, কোথাও বা হুবহু যদৃষ্টং অনুকৃতি-চিত্রণ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবি এ ধরনের ছবির থেকে একেবারেই আলাদা। যদি বলি, চিত্রকে তার কাহিনীর অনুষঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার চিত্রগত মূল্যেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথই অগ্রগণ্য, তাহলে বোধহয় খুব বাড়িয়ে বলা হবে না। এর জন্যে রবীন্দ্রনাথ ছবির নিজস্ব সত্তাগুলির ওপরে—অর্থাৎ রঙ রেখা বিন্যাস (কম্পোজিশন), রূপলক্ষণা (অ্যাপিয়্যারন্স্‌) ইত্যাদির ওপরেই—প্রধানত জোর দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অবশ্য গগনেন্দ্রনাথ তাঁর জ্যামিতিক ছাঁদে গড়া এক ধরনের ছবিতে চিত্রিত বস্তুর ফর্ম্‌গত ব্যঞ্জনার ওপরে প্রাধান্য আরোপ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর সেই ছবিগুলি কাহিনীর অনুষঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—বিশেষত রূপকথার কল্পলোক গগনেন্দ্রনাথের ওই ছবিগুলিকে একান্তভাবে আশ্রয় করেছে। রবীন্দ্রনাথের বেলায় তা হয় নি। 'সে' গল্পগ্রন্থে কিংবা 'খাপছাড়া' ছড়ার বইয়ে নিজের গদ্য-কাব্য রচনার চিত্ররূপ বা ইলস্ট্রেশন হিসেবে তিনি যেসব

ছবি এঁকেছেন, এমন কি সেগুলিও শুধু ছবি হিসেবেই—অর্থাৎ তাদের কাহিনীর সংশ্রববর্জিত হয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবেই—দ্রষ্টব্য হিসেবে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। "শুধু ছবি" হিসেবেই সেগুলি তাৎপর্যপূর্ণ।

আমাদের দেশে চিত্রকলার ক্ষেত্রে 'মডার্নিজ্‌ম্‌'-এর সূত্রপাত ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—একথা বললে বোধহয় খুব ভুল হবে না—যে-মডার্নিজ্‌ম্‌-এর মূল কথাটি হলো: যে-কোনো বস্তুকেই ছবির অঙ্গীভূত করা যায়, তার কোনো কাহিনীগত বক্তব্য থাকুক আর না থাকুক, যদি শিল্পীর চোখে সেই বস্তুর বিশেষ গড়নটির আর রূপলক্ষণটির, ফর্মের আর অ্যাপিয়্যার‍্যান্সের, কোনো বিশেষ তাৎপর্য ধরা পড়ে। ছবিতে কথকতাধর্মী রীতিসর্বস্বতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে আধুনিক ইওরোপীয় চিত্রকলায় এই 'মডার্নিজ্‌ম্‌' এসেছিল অনেক আগেই। রবীন্দ্রনাথ যে এটাকে আমাদের চিত্রকলায় খুব একটা সচেতনভাবে এনেছিলেন, তা নয়। কিন্তু তিনিই যে এটাকে আমাদের চিত্রকলায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন, সে কথাটা মনে রাখা দরকার। চিত্রকলার বাঁধা সড়কে অভ্যস্ত আমাদের মন তাই গোড়ার দিকে কবির ছবিকে সহজে গ্রহণ করতে পারেনি।

কবির এই চিত্রসাধনার যে একটি দীর্ঘকালীন ক্রমবিকাশ আছে, সে কথা সকলেই জানেন। স্বরচিত কবিতার পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি করার সময়ে বহু আগে থেকেই কবি সেটাকে একটা চিত্রগত ছন্দরূপ দিয়ে আসছিলেন। এই রেখার ছন্দ এসেছিল হাতে-লেখা রচনার বর্জিত অংশের অসংলগ্নতাকে যুক্ত করে পাণ্ডুলিপির অশোভনতাকে একটা সুদৃশ্য রূপ দেবার প্রয়াস থেকে। ক্রমে ক্রমে সেই রেখাছন্দ একটা স্পষ্ট গড়ন পেতে থাকল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই গড়নের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এলো একটা রূপলক্ষণ। শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে আবির্ভাব ঘটল বস্তুসাদৃশ্যের। এই বস্তুসাদৃশ্যই কবির ছবিকে চিত্রগুণে সম্পূর্ণ করে তুলেছে। রেখানির্ভর বিমূর্ত অলঙ্করণ থেকে বস্তুসদৃশগুণ-সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ ছবি—কবির চিত্ররচনার এই ধারাবাহিক পরিণতিটুকু মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবনযোগ্য।

কবির আঁকা প্রায় সমস্ত ছবিরই প্রধান অবলম্বন হলো রেখার বিন্যাসে। এই রেখানির্ভরতা বা লিনিয়রিজ্‌ম্‌ হলো ভারতীয় চিত্রকলার এক মস্তবড় ঐতিহ্য। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে এই খাটি ভারতীয় পরম্পরাগত লিনিয়র গুণটি সঞ্চারিত হয়েছে তার একটি প্রধান চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হিসেবে। রেখার

গতিকে অনুসরণ করেই কবির চিত্রকলা অঙ্কুরিত, বিকশিত ও রূপরঙে পরিণত। কবির আঁকা শেষ পর্যায়ের বর্ণাঢ্য ছবিগুলিও দৈবাৎ রেখার বুহুনি বা টেক্সচার থেকে মুক্ত। রঙীন ছবি থেকেও এই রেখার বুহুনি যদি সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে তার রূপের বাঁধন ও রঙের কারু, আশ্রয় অভাবে কতটা অবশিষ্ট থাকবে বলা কঠিন। এই লিনিয়র টেক্সচার বা রেখার বুহুনি হলো রবীন্দ্রনাথের ছবির একটি বিশিষ্ট শিল্পগুণ। প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতে এই সযত্ন ও নিপুণ টেক্সচার সৃষ্টির মূলে আছে তাঁর সেই গোড়ার দিকের পাণ্ডুলিপি সংশোধনকালীন রেখার অলঙ্করণ সৃষ্টির প্রয়াস। শেষ দিকে কবি যখন বিশেষ করে বর্ণ ব্যবহারের দিকেই ঝুঁকেছিলেন, তখনও তুলি দিয়ে বা আঙুলে ঘষে বর্ণলেপন ছাড়াও, কলমে টানা রেখা দিয়ে যেসব দৃশ্যচিত্র ও মানুষের ফিগার এঁকেছেন, তাতে রেখাপাতের অসাধারণ চারুতা ও নিপুণতা লক্ষ্যণীয়।

রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে: জীবজন্তু-পশুপাখির ছবি; নারীপুরুষের মুখ ও বিভিন্ন ভঙ্গিতে ধরা তাদের ফিগার; আর, দৃশ্যচিত্র। ফর্মগত যে বিশেষ বিশেষ গুণগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে তার নিজস্ব বিশিষ্টতা দেয়, এই তিন শ্রেণীর ছবিতেই সে ফর্মগত বৈশিষ্ট্যের অতিকৃতিকে একটা রেখানির্ভর ছন্দে বিধৃত করেছেন কবি। এই রেখা স্বতঃস্ফূর্ত, পরিমিত ও সাবলীল। এবং সেই জন্যেই চিত্রিত বিষয়টি এক কল্পনাময় ব্যঞ্জনা অর্জন করেছে। এই ব্যঞ্জনা কোথাও আদিম এক প্রাণ-জগতের রহস্যজালে অমূর্ত, কোথাও বা স্বপ্নে দেখা কোনো দৃশ্যের স্মারক, কোথাও বা রীতিমতো বাস্তবানুগ ও স্পর্শগ্রাহ্য—যদিও ফর্মপ্রধান।

এবং এই শেষোক্ত শ্রেণীর ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন প্রচুর সংখ্যায়। কবির আঁকা জীবজন্তু-পশুপাখিগুলি যেন কল্পনার জগতে দেখা বা স্বপ্নের জগতে জমে থাকা নানা রকম আকৃতি দিয়ে গড়া। ঠিক আমাদের চোখে-দেখা পরিচিত প্রাণী তারা যেন নয়, অথচ একেবারে আকারসাদৃশ্যহীনও নয়, বস্তুবিচ্ছিন্ন অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শনও নয়। কবির কল্পনায় তারা কিছুটা অতিকৃতি পেয়েছে, অনেক জায়গায় অপ্রাকৃত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিমূর্ত হয়নি। অন্য দিকে, কবির আঁকা নরনারীর মুখগুলিতে রূপ পেয়েছে নানা রকম ব্যক্তি-চরিত্র—যে-সব চরিত্রের প্রত্যেকটি অন্যগুলির থেকে আলাদা। কবির আঁকা এইসব মানুষের মুখ রীতিমতো বাস্তবানুগত। চরিত্রকে স্পষ্ট করে তোলার

জন্যে দেহসংস্থানগত বিন্যাসকে বিষমানুপাতিক বা ডিস্‌টর্ট্‌ করা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সাদৃশ্য রক্ষাই সেখানে প্রধান কথা।

জীবজন্তুর জগতের ওই ফ্যাণ্টাসী আর অতিকল্পনা এবং মুখাবয়ব ও পোর্ট্রেটগুলির এই বাস্তবানুগত্য—এই দুইয়ের মাঝখানে রাখা যায় দৃশ্য-চিত্রগুলিকে। এগুলি একই সঙ্গে রীতিমতো বাস্তবানুগ ও স্পর্শগ্রাহ্য, অথচ আদিম এক প্রাণজগতের রহস্যজালে ঘেরা, স্বপ্নে দেখা কোন্ এক চলমান দৃশ্যের স্মারক। এইসব ল্যাণ্ডস্কেপের অধিকাংশেই সুন্দর এক ধরনের আলোর খেলা আর রঙের ভাস্বরতার মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত করা হয়েছে কল্পনাময় একটি ত্রিমাত্রিক গুণ। রবীন্দ্রনাথের এইসব দৃশ্যচিত্রে সাধারণভাবে এমন একটা ঘনমান বা ভল্যুম এসেছে যা আমাদের চিত্রকলায় একটা নতুন জিনিস। এগুলিতে স্থানগত পরিপ্রেক্ষিত আনার বৈশিষ্ট্যটুকুও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়: এসব ছবিতে কবি যে উজ্জ্বল আর ভাস্বর রঙ ব্যবহার করেছেন, তা হয়ে উঠেছে পরিপ্রেক্ষিতের বিভিন্ন স্তরের ও ব্যাপ্তির আধার। রঙের এই বিশিষ্ট ও মৌলিক প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর ছবিতে সৃষ্টি করেছেন ত্রিমাত্রিকতা। বহু দৃশ্যচিত্রেই রঙের মধ্যে দিয়ে আলোর বিস্তারকে অপূর্ব সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। অন্ধকার সম্মুখদৃশ্যের পিছনে উচ্ছ্বসিত এক আলোর প্রভা একদিকে যেমন এক কল্পনাময় দ্যুতির সঞ্চার করেছে, অন্যদিকে তেমনি এক দেশগত মাত্রার ধারণাকে দর্শকের মনে স্পষ্ট করে তুলেছে। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ্যণীয় যে এইসব ছবিতে কম্পোজিশনের গুণগত মূল্য ততটা নেই, যতটা আছে ফর্ম্যাল বিন্যাস।

কবির আঁকা তিন শ্রেণীর ছবিরই প্রধান আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য হলো রেখানির্ভর ছন্দবিন্যাস। বস্তুর ফর্মগত বৈশিষ্ট্যকে—অথবা সেই বৈশিষ্ট্যের অতিকৃতিকে—প্রধানত রৈখিক ছন্দেই বিন্যস্ত করেছেন কবি। তাই, একথা বললে হয়তো খুব একটা অত্যুক্তি হবে না যে ভারতীয় চিত্রকলার সুচিরকালের ঐতিহ্য-অনুসারী লিনিয়রিজ্‌ম্ রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম সার্থক আধুনিকতার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হলো।

কাব্যনাটক প্রসঙ্গে

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সারা ইওরোপে বাস্তবধর্মী নাটকের বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব নাট্যকলার ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। হারমান হেটনারের 'ডাশ মডার্ন ড্রামা' ১৮৫১ সালে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে ইওরোপের প্রধান ও প্রচলিত নাট্যরূপ ছিল স্ক্রাইবের রোমান্টিক ইনট্রিগ্‌ নাটক। হেটনার তাঁর পুস্তকে নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্লেষণে ফ্রান্সিসকে সার্‌সে (Francisque Sarcay)-র রোমান্টিক নাটকের পথাবলম্বনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। ইবসেন এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং 'পিলার্স অব্ সোসাইটি' থেকে 'হেডা গেবলার' প্রমুখ নাটকের মাধ্যমে আধুনিক বাস্তবধর্মী নাটকের প্রবর্তন করেন। কিন্তু একথা সত্য যে বাস্তবধর্মী নাটক রোমান্টিক নাটক থেকেই প্রসূত। চরিত্রসৃষ্টি ও পরিবেশরচনার প্রথাগত ব্যবহার থেকে বাস্তবধর্মী নাটক মুক্ত নয়। সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষার স্তরভেদের পরিবর্তনই বাস্তবধর্মী নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। শব্দের সুসমঞ্জস শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিকল্পনায়ই নাটকের বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল; কারণ অভিনেতার বাচনিক প্রকাশক্ষমতায়ই নাটকের সার্থকতা নিরূপিত হয়। রোমান্টিক নাটক শব্দবাহুল্য ও বাগাড়ম্বর অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত (অবিশ্যি এই অলঙ্কৃত শব্দবিন্যাস অনেক সময় দূরত্বের ব্যঞ্জনা বহন করে), কিন্তু বাস্তবধর্মী নাটকে সৃষ্ট চরিত্রের ভাষা সহজ কথোপকথনের ভাষা। যদিও নাট্যকার সাধারণ পরিচিত ভাষাকে বিশেষ অভিজ্ঞতা পরিবেশনের জন্য একটা সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত রূপ দেন, তবুও এই ভাষায় বিভিন্ন চরিত্রের বিশিষ্ট ভাষার মোহ (illusion) সৃষ্ট হয়। এইজন্য ইবসেন 'পীর গীণ্ট' ও 'ব্রাণ্ড'-এর কাব্যময় ভাষা থেকে পরবর্তীকালে গদ্যরীতিতে প্রয়াণ করেন। এই ক্ষেত্রে ইবসেনের উক্তির উদ্ধৃতি হয়তো অপ্রাসঙ্গিক নয়: "My desire was to depict human beings and therefore I would not make them speak

the language of the gods." শ তাঁর নাটক 'এডমিরাল বাসকারভিল পদ্যে রচনা করেন, কারণ তাঁর গদ্যে লেখার সময় ছিল না। এই প্রসঙ্গে এলিয়ট মন্তব্য করেন: শ-এর পক্ষে উত্তম গদ্যরচনা সম্ভব, কিন্তু উত্তম পদ্যরচনা সুসাধ্য নয়। এলিয়ট কাব্যনাটকের সমর্থনে বলেন: "The tendency, at any rate, of prose drama is to emphasise the ephemeral and superficial; if we want to get at the permanent and universal, we tend to express ourselves in verse." এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' ও 'বিসর্জন'-এর মতো নাটক রচনা করেন কবিতায়, কিন্তু 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'র মতো তত্ত্বপ্রধান নাটক এবং 'রথের রশি'র মতো সমস্যাপ্রধান নাটকে গদ্যের মাধ্যম গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত গদ্য নয়, শিল্পচাতুর্যে উন্নত ভাষা; তত্রাচ ইবসেন ও চেকভের মতো রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন যে সমসাময়িক জীবনের রূপায়ণ গদ্যেই সম্ভব। সমসাময়িক জীবনের উপযোগী ছন্দপ্রকরণের আবিষ্কারই আধুনিক কাব্যনাটকের সমস্যা। প্রতীক ও সাঙ্কেতিকতার মাধ্যমে আধুনিক জীবন ও জগতের সমস্যাকে রবীন্দ্রনাথ গভীর তাৎপর্যে অন্বিত করেছেন। সমসাময়িক সমস্যা রূপায়ণের মধ্যেই তিনি গভীর নিত্যসত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন, ফলে তাঁর নাটক শাশ্বত মানবিক মূল্যে মণ্ডিত। তাঁর নাটকের উপযুক্ত পরিবেশে গানের ব্যবহার অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ও গভীর অর্থে প্রতিভাত। অবিশ্যি ভারতবর্ষের কবি তাঁর নাটকের শিল্পমাধ্যমের স্বকীয়তায় জীবনের সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা করেছেন স্বতন্ত্র নিরিখেই তার মূল্যায়ণ সম্ভব, ইওরোপীয় নাটকের সঙ্গে তাঁর রচনা তুলনীয় নয়, আর এই আলোচনা আপাতত প্রতীচ্যের নাটকেই সীমাবদ্ধ।

আধুনিক কাব্যনাটক বাস্তবধর্মী নাট্য আন্দোলনের পরিপন্থী নয়। সমসাময়িক জীবনের কাহিনী সাধারণ কাব্যময় ব্যঞ্জনাপূর্ণ ভাষায় রূপায়িত করাই কাব্যনাটকের উদ্দেশ্য। তবে শুধু পদ্যে লিখিত নাটকই কাব্যনাটকের অভিধা লাভ করে না, জীবনের কাব্যিক রূপায়ণের (Poetic interpretation) প্রয়াসই কাব্যনাটকের অন্বিষ্ট। কবিতা নিছক ভাষার মাধ্যম নয়, চরিত্র ও পরিবেশরচনার অবিচ্ছিন্ন উপাদান। আধুনিক কাব্যনাটকের সমস্যা প্রাকৃতবাদকে পরিহার নয়, বাস্তবধর্মিতার নব-পরিগ্রহণে জীবনের রূপায়ণ।

আজকের নাটক অবশ্যই গ্রীকনাটক বা এলিজাবেথীয় নাটকের চর্বিতচর্বণ হতে পারে না, তা আধুনিক সমাজ ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িকতার নতুন প্রতিফলন। পদ্যকেও তাই সমসাময়িক ভাষা ও পরিবেশানুগ করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

আধুনিক যুগের রুচি ও মানসিক অবস্থায় আধুনিক নাটকে গদ্যের ব্যবহার উপযোগী। এই পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যনাটকের উদ্ভব নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। সমরসেট মম্ তাঁর 'Summing Up' গ্রন্থে মন্তব্য করেন: বস্তুতান্ত্রিকতার দাবিতে পদ্যের বর্জন আধুনিক নাটকের চরম ভ্রান্তি। এ্যাবারক্রম্বি আবার আরও চড়া সুরে বলেন, গদ্যনাটক আধুনিক জড়বাদের এক বিশেষ রূপ, কবিতা তো জীবনসত্যের নির্যাসকেই ব্যক্ত করে। গদ্যনাটক অন্তর্নিহিত সত্যের উদ্ঘাটনের পরিবর্তে জীবনের ঘটনাকে প্রকাশ করে মাত্র। ভাবের গভীরতা, অনুভূতির তীব্রতা ও চিন্তার সূক্ষ্মতা প্রকাশে পদ্যের ব্যবহারই নাটকের পক্ষে উপযোগী। নাটকে সূক্ষ্মব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য নাটকে প্রাকৃতবাদের উদ্গাতা—ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ ও চেখভ প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বস্তুতান্ত্রিক নাট্যকারেরাও জীবন অভিজ্ঞতার সামগ্রিকতাকে প্রতীকময়তার সাহায্যে রূপায়িত করেন। ইবসেন ও চেখভের নাটক তাই গভীর জীবনবোধে উজ্জীবিত। 'হেডা গেবলার'-এ পিস্তলের প্রতীক ও 'সী গাল'-এ পাখির প্রতীক নাটকে গভীর অর্থময়তা দান করে।

কাব্যনাটক বলতে আমরা কী বুঝি স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে সে প্রশ্ন উঠতে পারে। এলিয়টের মতে কাব্যনাটক পদ্যে লিখিত নাটক নয়; বিশেষ ধরনের নাটক যা প্রাকৃতধর্মী অপেক্ষা বস্তুতান্ত্রিক, কারণ কাব্যনাটকে কবিতা প্রকৃতির অঙ্গসজ্জা নয়, তা বস্তুর গভীরেই দর্শকের চৈতন্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। এলিয়ট আরও বলেন: "Poetry is the natural and complete medium for drama; that the prose play is a kind of abstraction capable of giving you only a part of what the theatre can give." এলিয়ট গদ্যনাটকের পরিসমাপ্তি কামনা করেন নি, তিনি ইবসেন ও চেখভের গুণগ্রাহী ভক্ত; গদ্যনাটক ও পদ্যনাটকের যুগপৎ বিকাশই এলিয়টের কাম্য। সেক্স্পীয়রের নাটকে নাটকীয় মুহূর্ত রচনায় ও নাটকীয় গতি নির্দেশে কবিতার ভূমিকা আশ্চর্য প্রাণময়। তাঁর কবিতার অপূর্ব ছন্দ—নাটকে গতি ও উত্তেজনার সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়। আধুনিককালে

অনেক কাব্যনাটকে কবিতা ও নাটকের বিচ্ছেদের বিরক্তিকর প্রকাশ দেখা যায়। এই সমস্ত রচনায় কোরাসের বিবেচনাহীন প্রয়োগ ও দীর্ঘকবিতার ব্যবহারে নাটকের গতি প্রতিহত। আধুনিককালে কাব্যনাটক রচনার প্রচেষ্টা শুধুমাত্র নাটক পদ্যেলেখার প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমিত। ছন্দ, মিল, মাস্ক ও কোরাসের ব্যবহার নাটকের মানবিক রসকে ক্ষুণ্ণ করেছে; অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে কবিতা নাট্যধর্মী হয় না, নাটকের অলঙ্করণ হয় মাত্র। সেক্স্পীয়রের নাটক শুধু কবিতায় লিখিত নয়, চরিত্র ও পরিস্থিতির কাব্যিক কল্পনা নাটকীয় দ্বন্দ্বে বিকশিত। কবিতা তখনই নাট্যিক হয় যখন তা চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনীর গতিময়তাকে সাবলীলতায় প্রাণবন্ত করে। সেক্স্পীয়রের নাটকের বাগাড়ম্বর কখনই কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে জনসনের 'কাটিলাইন' (catiline) নাটকের সেনেট স্পীচ এবং 'জুলিয়স সীজার'-এর বাজার দৃশ্য উল্লেখযোগ। এ্যাণ্টনী ও ব্রুটাস-এর বক্তৃতার মধ্যে দুই চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা অতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত। আবার রোমের জনসাধারণের দুর্বলচিত্ততা ও অস্থিরতা প্রদর্শনে সেক্স্পীয়র নাটকের মূলবিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করেছেন, এবং নাটকের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। সমস্ত দৃশ্যই নাটকের সমগ্রতার সঙ্গে অখণ্ডভাবে জড়িত।

এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আধুনিক কাব্যনাটকের সমস্যা হলো: এই শিল্পমাধ্যম সমসাময়িক জীবনের সমস্ত সমস্যা ও যন্ত্রণাকে প্রতিফলিত করতে পারে কিনা। এ্যাবারক্রম্বি আমাদের সামনে এই প্রশ্নই উপস্থাপিত করেছেন। এলিয়ট এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে কাব্যনাটক বিষয়বস্তু আহরণ করবে দূরবর্তী ঐতিহাসিক কাল বা দেশের ও জাতির পুরাণ থেকে। কাব্যনাটকে দূরবর্তীকালের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করার প্রয়োজন, তবেই চরিত্রের কবিতায় কবিতা-সংলাপে স্বাভাবিকতা পরিস্ফুট হবে। ঐতিহাসিক কালের পটভূমিকায় বিধৃত নাটকে পাদপ্রদীপের আলো, শব্দ ও পোশাক কবিতার ব্যবহারকে স্বাভাবিক, সুসমঞ্জস ও বিশ্বাসযোগ্য করে। এলিয়টের এই উক্তি কাব্যনাটকের দুর্বলতারই অভিজ্ঞান। এলিয়টের অতি-আধুনিক দু-একটি কাব্যনাটক ছাড়া এমন কোনো দৃষ্টান্তই নেই যেখানে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান লক্ষণীয়। 'দি এ্যাসেণ্ট অফ এফ সিক্স' (The Ascent of F 6) নাটকে সমসাময়িক জীবনকে সুদূর ও প্রত্যক্ষ

বাস্তব—এ দুই কোটি থেকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু একটি অপরটির দ্বারা এমনভাবে আক্রান্ত যে তাতে নাটকের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তার মূল রস দর্শকচিত্তে সঞ্চারিত করা সম্ভব হয় নি। এলিয়ট তাই বলেছেন যে কাব্যনাটককে তার স্থান নিতে হলে গদ্যনাটকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। কবিতাকে সাধারণ মানুষের জগতে আনতে হবে, সাধারণ মানুষকে কবিতার আদর্শ-জগতে উন্নীত করলে চলবে না। এলিয়ট আরও বলেছেন: নাটকীয় দ্বন্দ্ব দর্শকের চিত্তকে এমনভাবে আকৃষ্ট করবে যে দর্শক সাধারণ নাটকের ভাষামাধ্যম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত থাকবে। একদিক থেকে সব শিল্পই কৃত্রিম, কারণ জীবনের সারবস্তুকে গ্রহণ করে আঙ্গিক পারিপাট্য ও ছন্দোবদ্ধ ঘটনা পারম্পর্যে জীবনের সুসঙ্গত রূপদানই শিল্পের লক্ষ্য। এলিয়ট নাটকে গদ্য থেকে পদ্যে পরিবর্তন সমর্থন করেন না, কারণ এই পরিবর্তনে নাটকের মাধ্যম সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার অবকাশ দর্শকের থাকে। কিন্তু আমরা সেক্‌স্পীয়রের নাটকে গদ্য ও পদ্যের সহজ মিশ্রণের অপূর্ব ফল লক্ষ্য করেছি। 'ম্যাকবেথ'-পোর্টার দৃশ্যে গদ্যের ব্যবহার দর্শকের উপভোগে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না, বরঞ্চ এই পরিবর্তন স্বাভাবিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। কাব্যনাটকের ভাষার আসল সমস্যা হলো বিশেষ ছন্দগ্রন্থনের আবিষ্কার যা নাটকের সব মুহূর্ত ও সব পরিস্থিতির পক্ষেই উপযুক্ত। এলিয়ট মনে করেন যে যদি নাটকে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা ছন্দে প্রকাশযোগ্য নয়—তাহলে সেটা নাটকে পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। সেক্‌স্পীয়রের নাটকে এমন ছন্দময় ভাষা আছে যা সুন্দর কবিতা নয়, যার নাট্যপ্রয়োজন শুধু চরিত্র ও পরিবেশ প্রকাশেই। এলিয়ট ছন্দের অচেতন প্রতিক্রিয়ার ওপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেক্সপীয়রের নাটকে অনেক সময়েই আমরা কাব্যময় ভাষা সম্বন্ধে সচেতন থাকি না, জীবনের নাটকায়িত মুহূর্তই আমাদের আকৃষ্ট করে রাখে। কিন্তু অনেক নাটকীয় মুহূর্তই কাব্য ও নাটকের সুষ্ঠু সমন্বয়ের আবেদন বহন করে। হ্যামলেটের কণ্ঠে "to be or not to be" স্বগতোক্তি একাধারে তার আত্মার মর্মন্তুদ হাহাকার প্রকাশ এবং চরিত্রবিকাশের সঙ্গেই নাটকের গতিকে ত্বরান্বিত করে, অন্যদিকে ভাষার অনবদ্য কাব্যমহিমায় নাটকীয় মুহূর্ত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়। এইখানেই নাটক কবিতার অপূর্ব মেলবন্ধন। নাটকের ছন্দ কবিতার ছন্দ অপেক্ষা অনেক বেশি সুষ্ঠু ও প্রকাশযোগ্য হওয়া

প্রয়োজন। নাট্যকার বিভিন্ন চরিত্রের মেজাজ ও বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী ছন্দের ব্যবহার করেন। অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি, গতি ও মৌখিক প্রকাশ ছন্দে নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক কাব্যনাট্যকাররা ছন্দকে সহজ স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন না বলেই তাঁদের নাটক কবিতা হয়, কবিতা নাটক হয় না।

আধুনিককালে ইওরোপে এবং বিশেষত ইংলণ্ডে প্রাকৃতবাদপ্রণোদিত গদ্যনাটকের বিপক্ষে একটা চাপা প্রতিক্রিয়া সন্দেহাতীতরূপেই লক্ষণীয়। আজকের দিনে এটা পরিষ্কার যে ইবসেনীয় নাটকের গভীরতা ও সূক্ষ্মতা পরিহার করে বাস্তবধর্মী নাটক তার স্থূল নাটকীয় রীতিকে গ্রহণ করেছিল। জগতের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বময় সম্বন্ধ, চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ সম্বন্ধে কাব্যময় জিজ্ঞাসা, এক শব্দেই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভাস—যা ইবসেনের নাটককে চিরস্থায়ী মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে তা শ এবং তাঁর অনুবর্তীগণ উপলব্ধি করতে পারেন নি। যদিও শ এবং ম্যানচেস্টার স্কুলের নাট্যকারগণ নাটককে মানসিক আলস্য থেকে মুক্ত এবং ভাবপ্রবণ চটুলতা থেকে বুদ্ধিদীপ্ত জাগ্রত চেতনায় উন্নীত করেছেন, তবুও একথা সত্য যে এই নাটক মানবিক চেতনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত। ব্যক্তি এবং সামাজিক পরিবেশের যান্ত্রিক সম্বন্ধই তাঁদের সমস্ত নাটকে বর্ণিত। এই বাস্তবধর্মী নাট্যরীতি ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে সীমিত করেছে এবং আধুনিক নাটক তাই সাহিত্যের সীমাহীন মহত্ত্ব থেকে বঞ্চিত। ইবসেন ও চেখভ গদ্যের মাধ্যমেও অনেক ভাবগম্ভীর মুহূর্তকে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এই দুইজন নাট্যকারের নাটকে বহু স্থানের প্রকাশ যে গদ্যের দ্বারা সীমিত ও প্রতিহত, তা অবশ্য-স্বীকার্য।

আধুনিককালে ইংলণ্ডে কাব্যনাটকের প্রচেষ্টা শুরু হয় ইয়েটস্-এর উৎসাহে ও উদ্দীপনায়। ডাবলিনের এ্যাবে থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির মূলে ইয়েটসের অবদান অনস্বীকার্য। ইয়েটস্ তাঁর নাটকপ্রচেষ্টার প্রারম্ভে একধরনের রোমান্টিক নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন, গীতিকবিতার প্রাচুর্যের সঙ্গে প্রতীকতাযুক্ত এবং আয়রলণ্ডের লোকসংস্কৃতিতে উজ্জীবিত স্বকীয় পরিমণ্ডলে যা বিধৃত। ইয়েটস্ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই কথা বলেছেন: আমাদের এমন নাটক লিখতে হবে যা নাট্যশালাকে মানসিক উত্তেজনা ও উল্লাসের কেন্দ্র করবে—যেখানে মন মুক্ত হবে, যেমন গ্রীসদেশে ও ইংলণ্ডে

ঘটেছিল। উপন্যাসের বর্ণনাপদ্ধতি নাটককে প্রভাবিত করার ফলে স্থূল ব্যক্তিত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, সমস্যা ও বক্তব্যের প্রাধান্য নাটকের প্রাণশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যশালার সম্পূর্ণ সংস্কার-সাধনে নাটকের সাহিত্যিক মূল্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়েটস্ নাট্যআন্দোলন গঠন করেন। তিনি বলেছেন: "I think the theatre must be reformed in its plays, its speaking, its acting and its scenery··· there is nothing good about it at present." উনবিংশ শতাব্দীর নাটকের সাফল্যের মূলে ছিল দক্ষ অভিনেতার অভিনয় ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতার ওপর নাট্যকাররা নির্ভরশীল ছিলেন। সেক্স্পীয়রীয় নাটকের পুনরুজ্জীবন এবং ফেলপ্স্, ম্যাকরিডী থেকে আরম্ভ করে চার্লস্ কীন, আরভিং এবং বিংশ শতাব্দীতে বীরবম্ ট্রীর অভিনয়ক্ষমতা ইংলণ্ডের নাট্যশালায় উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত। দৃশ্যপটসজ্জা ও অভিনয়দক্ষতাই এযুগের নাটকের বৈশিষ্ট্য, নাটকের কথা বা শব্দ—অর্থাৎ সাহিত্যিক মূল্য ছিল উপেক্ষিত।

একথা অবিসংবাদিতভাবেই সত্য যে আধুনিককালে ইংলণ্ডে যে নাট্যআন্দোলন বর্তমান তার দুই নিয়ামক হলেন ইয়েটস্ এবং শ। শ বাস্তবধর্মী গদ্যনাটককে তার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন: চরিত্রের সংঘাত বা ভাবের দ্বন্দ্ব নয়, দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত প্রদর্শনেই অতি চমৎকারভাবে প্রচারকে শিল্পে উন্নীত করেছেন। কাব্যনাট্যের পুনরভ্যুত্থানে ইয়েটসের ভূমিকার মূল্য তাঁর স্বকীয় ছন্দোবৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠায়, যে ছন্দোবৈশিষ্ট্য সেক্স্পীয়রের অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য-নাট্যকারদের সঙ্গে ইয়েটসের পার্থক্য এইখানেই। ইয়েটসের নাটকের মঞ্চ-সাফল্য অবিশ্যি খুবই সীমিত, তাঁর নাটক প্রতীকী ছায়ার অস্পষ্ট কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। শেষপর্যায়ের নাটকে ইয়েটস্ প্রাচ্যের নাট্যশালার দৃশ্যপট ও অভিনয়ের উপাদান গ্রহণ করেন। তিনি মুখোসব্যবহার ও জাপানী ন' নাটকের সঙ্গে শব্দের সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার প্রয়াসী ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডের ষ্টিফেন ফিলিপসের কয়েকটি কাব্যনাটক এবং এলরয় ফ্লেকারের 'হাসান' নাটক মঞ্চসাফল্যের গৌরব অর্জন করে। কিন্তু এই সাফল্যের পশ্চাতে ছিল দুইজন নাট্যকারেরই উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক নাটকের প্রতি আনুগত্য। ফিলিপসের

নাটকের ছন্দ সুসমঞ্জস ও সুষ্ঠু; মারস্টন ও লিটনের গম্ভীর ও আড়ম্বরপূর্ণ ছন্দের পর ফিলিপসের সংহত ও সুসঙ্গত ছন্দপ্রকরণ শ্রোতার মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। 'হাসান' নাটকটির সাফল্যের মূলে ছিল প্রয়োগনৈপুণ্য। এই নাটকের প্রয়োগে প্রাচ্যের নাট্যপ্রযোজনার চিত্রকল্পের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধের পরবর্তীকালে 'চু-চিন চাউ'-এর অসাধারণ সাফল্য এই নাটকের প্রযোজনার পথ নির্দেশ করে। বিংশশতাব্দীর প্রথমপাদে অনেকেই কাব্যনাটক রচনায় ব্রতী হন—কিন্তু এই দুইজন নাট্যকার ব্যতীত অন্য কেউই সাধারণ মঞ্চে সার্থকতা লাভ করেন নি। ইয়েটসের কাব্যনাটকের নাটকীয় আবেদন সীমিত—নাট্যিক ক্রিয়াশীলতার অভাব এবং চরিত্রের ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যের নিষ্প্রভতা তাঁর নাটকের পরিমণ্ডলকে অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন করেছে। তাঁর সৃষ্ট 'ডিয়েরড্রে' (Deirdre), 'নাসি' (Naisi), 'ডেকটোরা' (Dectora) এবং 'ফরগাল' (Forgal) মানবচরিত্র নয়, স্বপ্ন-প্রতীক। চিত্রকল্প, গীত, স্বপ্ন ও পুরাণের টানাপোড়েনে তাঁর নাটক সৃষ্ট। 'অল্-হকস্-ওয়েল' নাটকের ভূমিকায় তিনি বলেছেন: লণ্ডনের সাধারণ মঞ্চে অভিনয়কালে দর্শকের ঔদাসীন্য তাঁকে পীড়া দিয়েছে। এ্যাবে থিয়েটারেও তাঁর নাটকের জন্য উপযুক্ত দর্শক তিনি পান নি। নাটকের সার্থকতা জনপ্রিয়তার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। মঞ্চে উপযোগী দর্শকসাধারণের গ্রহণযোগ্য নাটকই সার্থক নাটক। নাটকের সাহিত্যিক মূল্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, কিন্তু একথাও সত্য যে শুধু সাহিত্যিক মূল্যসমৃদ্ধ নাটকের প্রয়োজনীয়তা অল্প। সার্থক নাট্যসাহিত্য নিত্যসত্য ও সমসাময়িক আবেদনের সমন্বয় সাধনে যত্নশীল। সেক্স্পীয়রের শ্রেষ্ঠত্বের উৎস এই অপূর্ব সেতুবন্ধনে।

লেসলি এ্যাবারক্রম্বে তাঁর 'ডেবরা' (Deborah) নাটকে সমসাময়িক বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের ভাষার কবিতায় রচনা করেন। তাঁর এই আদর্শ ভবিষ্যৎ কাব্যনাটকে প্রভাব বিস্তার করেছে, যদিচ তা সর্বস্বীকৃত নয়। লেসলি এ্যাবারক্রম্বে ও গর্ডন বটমলির নাটকে আধুনিক কাব্যনাটকের উপযোগী পদ্যরীতির প্রবর্তন লক্ষণীয়। এলিজাবেথীয় নাটকের ব্ল্যাঙ্কভার্সের অন্ধ ও অক্ষম অনুকরণের পর সাধারণ কথ্যভাষাশ্রিত পদ্যরীতির প্রবর্তন আধুনিক কাব্যনাটকের ইতিহাসে এক বিশেষ ভূমিকা রচনা করে। এ্যাবারক্রম্বের নাটকে কবিতা বাস্তবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইয়েট্সের মতো

তিনি পরীরাজ্যের গায়ক নন—আধুনিক জীবনের ভাব ও অনুভূতিকে সমসাময়িক ছন্দপ্রকাশে অভিব্যক্ত করেছেন। 'ডেবরা' নাটকে বিভীষিকাময় প্লেগের বর্ণনায় তিনি যে প্রকাশক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে এলিজাবেথীয় কাব্যরীতি থেকে পার্থক্য সূচিত করে। আমেরিকায় আরকিবল্ড ম্যাকলিস তাঁর 'প্যানিক' নাটকে এবং ম্যাক্সওয়েল এণ্ডারসন তাঁর 'উইন্টাসেট' নাটকে কাব্যনাটক চর্চার নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেন। এই সমস্ত নাট্যকারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডে টি. এস. এলিয়ট, অডেন ও ক্রীস্টফার ফ্রাইয়ের কাব্যনাটক রচনার প্রয়াস গভীরতর প্রেরণায় সঞ্জীবিত।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি কাথিড্রাল'-এর অভূতপূর্ব মঞ্চসাফল্যে কাব্যনাটকের সমস্যা ও সম্ভাবনা নূতনভাবে প্রতিভাত হয়। মার্কারী থিয়েটারে মার্টিন ব্রাউনের নেতৃত্বে কাব্যনাটকের মঞ্চপ্রয়াস নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ১৯৩৯ সালে এলিয়টের 'ফ্যামিলী রিইউনিয়ন', নিকলসনের 'দি ওল্ড ম্যান অফ দি মাউনটেনস্', রনাল্ড ডানকানের 'ওয়ে টু দি টুম্', ক্রীস্টফার ফ্রাইয়ের 'ফিনিক্স্ টু ফ্রিকয়েন্ট', পেটার এট্সের 'দি এ্যসাসিন' প্রভৃতি নাটক কাব্যনাটকের ইতিহাসে প্রভূত সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। এলিয়ট তাঁর প্রথম নাটক থেকে শেষ নাটক ('এল্ডার স্টেট্স্ম্যান') অবধি নতুন নতুন পরীক্ষায় রত। 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল'-এর সাফল্যের মূলে আছে গল্পের অতিনাটকীয় কাঠামো। বেকেটের আত্মাহুতি ইংলণ্ডের প্রতিটি লোকের কাছে আকর্ষণীয়। তাছাড়া এই নাটকে চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের ইঙ্গিতও অনেককে আকৃষ্ট করে। এই নাটকে চিন্তার জটিলতা ও গভীরতা সহজ ও স্বচ্ছ ভাষায় অভিব্যক্ত। ছন্দগ্রন্থনের বৈচিত্র্যের জন্য নাটকের গতি সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। নাট্যকার দুই স্থানে গদ্য ব্যবহার করেছেন, বেকেটের খ্রীষ্টমাস্ সারমন প্রচারে, আর চারজন নাইটের দর্শকের কাছে তাদের কৈফিয়ৎ পেশ করার সময়ে। মিলযুক্ত দুই চরণ, মধ্যযুগীয় দৃঢ়তা সমন্বিত মুক্তছন্দ কবিতার প্রয়োগ, স্বরসঙ্গতি ও অনুপ্রাসযুক্ত দীর্ঘ ছন্দের ব্যবহার ও ছন্দের পুনরাবৃত্তি কাব্যনাটকের প্রয়াসকে অনেকটা পরিমাণে সার্থকতামণ্ডিত করেছে। নাটকের মূলরস সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক হলেও বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে গৃহীত এবং সমসাময়িক তাৎপর্যে বিন্যস্ত। এইখানেই এই নাটকের আংশিক সার্থকতা। ইবসেন, চেখভ,

স্ট্রিণ্ডবার্গ, শ, সিন ওকেসী প্রভৃতি গদ্যনাট্যকারেরা সমসাময়িককালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা তাঁদের নাটকে প্রতিফলিত করে আধুনিক জীবনের ট্রাজেডি ও কমেডিকে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এলিয়টের মতে কাব্যনাটকের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে গভীরতর, কাব্যনাটক জীবনযন্ত্রণার অন্তর্গূঢ় সত্যকে উদ্ঘাটিত করতে সমর্থ। তাই তিনি 'ফ্যামিলী রিইউনিয়ন' নাটকে সমসাময়িক বিষয়বস্তু ও ভাষা ব্যবহারে প্রয়াসী হয়েছেন। এই নাটকে পারিবারিক হার্দ্যকথোপকথনের সঙ্গে কবিতার সূক্ষ্ম সুরের অন্বয় এক অপূর্ব ছন্দ ও সুষমায় প্রতিষ্ঠিত। কবিতায় আধুনিক কথ্যভাষারীতির ব্যবহারের সুন্দর দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করছি :

Ivy— Really, Harry ! How can you be so callous ?
I always thought you were so fond of John.
Violet— And if you don't care what happens to John
You might show some consideration to your mother.
Amy— I do not know very much :
And as I get older, I am coming to think
How little I have ever known.

এরই সঙ্গে আধুনিক যুগচেতনা প্রকাশোপযোগী কবিতার নূতন ছন্দের প্রবর্তন প্রণিধানযোগ্য :

"We like to appear in the newspapers
So long as we are in the right column.
We know about the railway accident
We know about the sudden thrombosis
And the slowly hardening artery......"

নতুন নাট্যিক ভাষার এই ছন্দের ব্যবহার কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে সার্থক প্রয়াস। ছন্দোবদ্ধ স্বরসংঘাতযুক্ত এবং অক্ষর নিয়ন্ত্রিত পংক্তির ব্যবহার ছন্দের নমনীয়তা ও বৈচিত্র্যের সহায়ক।

আমেরিকান সমালোচক ডেনিস্ ডনোগুই বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রমাণ করেছেন যে এলিয়ট তাঁর এই শিল্পমাধ্যমের প্রচেষ্টায় সার্থক হয়েছেন 'দি কনফিডেনসিয়ল ক্লার্ক' নাটকে। 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' এবং 'ফ্যামিলী

রিইউনিয়ন' নাটকে শব্দ ও ছন্দ অনেকাংশে নাটকাতিরিক্ত। কবিতার অনেক চরণই স্বাধীন কাব্যসত্তায় সমুজ্জল। এলিয়টের মতে এই ধরণের কবিতা কাব্যনাটকের নাট্যিক ক্রিয়াশীলতা ও চরিত্রবিকাশের পরিপন্থী। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল'-এর ছন্দপদ্ধতি নেতিবাচক। এই নাটকে ছন্দের সমস্যা তিনি সমাধান করতে পারেন নি। 'ফ্যামিলী রিইউনিয়ন'-এ তিনি যে ছন্দ-পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা সমসাময়িক কথ্যরীতির সঙ্গে সংযুক্ত। এখানে বিচিত্র দৈর্ঘ্য ও বিভিন্ন সিলেব্যলযুক্ত পংক্তি—একটা মধ্যস্থ যতি ও তিনটি স্বরাঘাত সমন্বিত। যতি এবং স্বরাঘাত পংক্তির যে কোনো স্থানেই ব্যবহৃত হতে পারে, স্বরাঘাত সিলেব্যল দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এই নাটকে কোরাসের ব্যবহার অনেক স্বল্প। কিন্তু ফ্যামিলীর চারজন চরিত্রের ব্যক্তিভূমিকা এবং কোরাসের অংশ হিসেবে ভূমিকার প্রয়োগ মোটেই সুসংগত নয়। ছন্দপদ্ধতির গুরুত্বও চরিত্র ও কাহিনীকে ম্লান করেছে। নাটকীয় ঔচিত্য ও প্রয়োজনীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করে এলিয়ট নিছক ছন্দের জন্যই ছন্দোবিহারের প্রলোভনকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা যায়।

"O sun, that was once so worm, O light that was taken
For granted
When I was young and strong, and sun and light unsought
For
And the light unfeared and the day expected
And clocks could be trusted, tomorrow assured
And time would not stop in the dark."

এ্যামির clock প্রীতি তার চরিত্রের অংশ ; কিন্তু শেষ মুহূর্তে এ্যামির চিৎকার তাৎপর্যহীন :

"Agatha ! Mary ! Come
The clock has stopped in the dark."

'দি কনফিডেনসিয়াল ক্লার্ক' নাটকে এলিয়ট ছন্দগ্রন্থনের সামঞ্জস্য ও ঐক্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। কোনোস্থানেই কবিতা ও নাটকের বিচ্ছেদ হয় নি বা কাব্যিক স্বাতন্ত্র্য নাটকীয় মুহূর্তের দুর্বলতা সূচিত করে নি। হাস্য-রসোদ্দীপক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল এই উপভোগ্য কমেডি দর্শকের চিত্তকে

প্রথম থেকেই উদ্দীপিত করে রাখে। এই নাটকের গভীর তাৎপর্য স্থূল হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন। কল্বির পিতৃত্ব দাবি করেছে স্যার ক্লড ; মাতৃত্ব দাবি করেছে স্যার ক্লডের স্ত্রী এলিজাবেথ। মিসেস্ গুজার্ড-এর কাছে কল্বি শৈশব থেকে পালিত; যদিচ মিসেস্ গুজার্ড কলবির পিতা বা মাতার সংবাদ জানেন না। এই নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে কাহিনী আবর্তিত। লকাষ্টা ও কলবির চরিত্রের মাধ্যমে এলিয়ট একটি ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন। হেনরি হিউস মন্তব্য করেছেন : এই নাটকে আমরা এই ইঙ্গিত পাই যে নৈষ্ঠিক ও প্রতিভাধর মানুষই জীবনে ঐক্য লাভ করে, অবশিষ্ট মানুষ দুই জগতের অধিবাসী এবং দুই জগতই তাদের কাছে কৃত্রিম। নাটকীয় বিস্ময় ও অনিশ্চয়তা নাটকের গতিকে কোথাও মন্থর করে নি; দর্শক উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলের সঙ্গে ঘটনা প্রবাহকে অনুসরণ করে।

'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্র্যাল' ও 'ফ্যামিলী রিইউনিয়ন' নাটকের দুর্বলতাকে এলিয়ট বহুলাংশে বিদূরিত করেছেন 'ককটেল পার্টি' নাটকে। প্রথমত তিনি গ্রীক গল্পের সঙ্গে সমসাময়িক পরিবেশের সমন্বয় সাধন করতে পারেন নি উপরোক্ত দুই নাটকে। অধিকন্তু এই নাটকে নায়কের পরিণতি নাটকীয় পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে পরিগণিত নয়। নাটকের শেষে দর্শকের প্রতিক্রিয়া দ্বিধাবিভক্ত—পুত্রের আধ্যাত্মিক মুক্তি এবং মাতার ট্র্যাজেডীতে মন সমানভাবেই আকৃষ্ট হয়। নাটকের ক্ষেত্রে এটা যে বিশেষ দুর্বলতা সন্দেহ নেই। 'ককটেল পার্টি' নাটকে সর্বপ্রথম এলিয়ট কোনো কোরাস ও অতিপ্রাকৃত চরিত্রের ব্যবহার করেন নি। 'ককটেল পার্টি' ও 'দি কন্‌ফিডেনসিয়েল ক্লার্ক' নাটকে তিনি কাব্যরীতিকে সাধারণ ভাষার সঙ্গে সমন্বিত করেন। নাটকাতিরিক্ত কবিতাকে সব সময়েই তিনি পরিহার করেছেন এবং ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে দর্শকের কৌতূহল এবং বিস্ময় সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছেন। নাটকের প্রয়োজনানুগ কবিতাকে তিনি কতখানি নমনীয় করতে সমর্থ হয়েছেন তা আমরা 'দি কন্‌ফিডেনসিয়েল ক্লার্ক' নাটকের দুই স্থানের পদ্যরীতি উদ্ধার করলেই উপলব্ধি করতে পারি :

Kaghan— I've just given her lunch. The problem with locusta
Is how to keep her fed between meals.

Locusta—B, You are a beast. I've a small appetite
But the point is that I'am penniless.

এরই পাশে নৈরাশ্যক্লিষ্ট স্রষ্টার গভীর ভাব প্রকাশের কাব্যময় ভাষা লক্ষণীয় :

Sir Claude : To be among such things,
If it is an escape, is escape into living
Escape from a sordid world into a pure one.
Sculpture and painting—I have some good things
But they haven't this...remoteness I have
Always longed for.
I want a world where the form is the reality
Of which the substantial is only a shadow.

কবিতার এই সহজবশ্যতা—যা নাটকের গতি নিয়ন্ত্রণ ও চরিত্রবিকাশের পথে অপরিহার্য, তা এলিয়ট পূর্ববর্তী নাটকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হন নি।

নাটকের প্রয়োজন সাধনে উপযুক্ত ও শোভন পদ্যরীতি ব্যবহার কাব্য-নাট্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই জন্যই নাটকীয় কৌশল, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও কমেডির চমক থাকা সত্ত্বেও খ্রীষ্টফার ফ্রাই কাব্যনাটকের নতুন সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন নি। তাঁর কোনো কোনো নাটক মঞ্চ-সাফল্যের গৌরব অর্জন করেছে, কিন্তু কাব্যনাটকের মূল সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতে তার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করতে পারে নি। খ্রীষ্টফার ফ্রাইয়ের নাটকে শ এবং ওসকার ওয়াইল্ডের কমেডির চমক বর্তমান। তিনি তাঁর নাটকে শ, চেখভ এবং পিরানদেল্লোর প্রবর্তিত ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর নাটকগুলিতে বিষয়বস্তু অপেক্ষা বিশেষ মানসিক মেজাজই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'দি লেডীজ নট ফর বার্নিং' নাটকে টমাস মেনডীপ 'ডেভিল্স ডিসাইপেল'-এর নায়কেরই অনুবর্তী। খ্রীষ্টফার ফ্রাই সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে তিনি কাব্যনাটকের মাধ্যমে দর্শকদের আনন্দ বিতরণে সমর্থ হয়েছেন। 'এ ফিনিক্স টু ফ্রিকয়েন্ট' একটি দীর্ঘ অঙ্কে সমাপ্ত এবং মিলহীন ছন্দে ও অপূর্ব চিত্রকল্পে রচিত। বিষয়বস্তু পেট্রোনিয়স গল্প থেকে সংগৃহীত এবং কমেডির চমকে উজ্জ্বল। এক রোমান লেডী স্বামীর সমাধির পাশে শায়িত। অন্যদিকে একজন সৈনিক ছয়টি মৃতদেহ পাহারায়

রত। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দুইজনের মধ্যে আসক্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখনই একটি মৃতদেহ অপহৃত হলো। অপরাধ ক্ষালনের জন্য সৈনিক এবং সেই স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহটি অপহৃত মৃতদেহের পরিবর্তে রক্ষা করার সংকল্প গ্রহণ করল। নাটকের সমাপ্তি সূচিত হলো সৈনিকের স্বাস্থ্যপানের মধ্য দিয়ে। ফ্রাইয়ের এই নাটকটি মঞ্চসাফল্যের গৌরব লাভ করেছে, কারণ মঞ্চকৌশল সম্বন্ধে ফ্রাই সম্পূর্ণরূপে অবহিত। তাঁর কল্পিত পরিস্থিতি ও সংলাপ দর্শকদের মনকে উত্তেজিত ও আকৃষ্ট করে। 'ভেনাস অবজারভ্ড' নাটকে চরিত্রগুলির উপস্থাপনা শেক্স্পীয়রের বেনেডীক্ ও বিয়েট্রিস্ চরিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু চরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্ব, পরিস্থিতির নতুনত্ব এবং কমেডির চমক সত্ত্বেও কাব্যনাট্যের মূল সমস্যা সমাধানে ফ্রাইয়ের প্রচেষ্টা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। তাঁর নাটকে কবিতা চরিত্র ও পরিস্থিতিকে বহন করে মাত্র, রূপায়িত করে না। কবিতা আভরণ মাত্র, রূপকল্প নয়। এই দৃষ্টান্ত দিলেই এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হবে। 'ভেনাস অবজারভ্ড' নাটকে হিল্ডা তাঁর স্বামী সম্বন্ধে বলেছেন :—

"—Once he had worn away the sheen
Of his quite becoming boyhood, which mode me fancy him
There was nothing to be seen in Roderic
For mile after mile, except
A few sheepiike thoughts nibbling through the pages
Of a shiny weekly, any number of dead pheasants."
.........etc.

এই পংক্তিগুলিতে ফ্রাইয়ের বর্ণনাসুষমা প্রশংসনীয়—দর্শকমনে মুগ্ধতা সঞ্চারে পারদর্শী। কিন্তু হিল্ডার চরিত্রসৃজনে এই পংক্তিগুলির দান খুবই সামান্য। স্বামীর হীন চরিত্র সম্বন্ধে হিল্ডার ধারণা এই পংক্তিগুলির মাধ্যমে ধরা পড়ে না। সুপরিকল্পিত কাব্যভঙ্গি এখানে স্বাধীন-বক্তার অনুভূতির সঙ্গে উপযুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত নয়। অর্থাৎ, কবিতা এখানে আনুষ্ঠানিক, নাট্যিক নয়।

এলিয়টের কাব্যনাট্য প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গ্রুপ থিয়েটারে অনুষ্ঠিত অডেনের 'ডান্স অফ ডেথ', এবং 'দি ডগ বিনিথ দি স্কিন' কাব্যনাট্য উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সভ্যতায় মৃত্যু ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে

প্রথমোক্ত নাটকটির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি নৈরাশ্যের কালোছায়ায় আচ্ছন্ন—বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ ও বুদ্ধির চমক নাটকটিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে। শেষোক্ত নাটকটি প্রাণোচ্ছল প্রহসন। মার্কসীয় জীবনবাদ অডেনের এই দুই নাটকে অনুসৃত। কিন্তু মার্কসীয় দর্শনে নিস্পৃহ দর্শকদের মনও অডেনের নাটকের বিদ্রূপ ও বুদ্ধির দীপ্তিতে আকৃষ্ট হয়। 'দি এসেন্ট অফ এফ সিক্স' নাটকটিতে অডেন বিশেষ কলাকৌশলের পরিচয় দিলেও নাটকটি সার্থকতালাভে বঞ্চিত। রাজনীতি ও মনস্তত্ত্বের মিলন দর্শকদের মনে বিহ্বলতার সৃষ্টি করে মাত্র। শেষ অঙ্ক রূপক, মনস্তত্ত্ব এবং দুরূহ কলা-কৌশলে ভারাক্রান্ত। এই প্রসঙ্গে স্পেণ্ডারের 'দি ট্রায়াল অফ্ জাজ্' কাব্যনাটকটি উল্লেখযোগ্য। এই নাটকে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীর মধ্যে বিবাদ এবং এই বিবাদের ফলে কিরূপে 'নিরপেক্ষ ন্যায়নীতি' বিচলিত হয় তা দেখানো হয়েছে। এই নাটকে নাটকীয় শক্তি ও কৌশলের পরিচয় থাকলেও চরিত্রগুলির প্রাণহীনতা নাটকটিকে নিষ্প্রভ করেছে। রাজনৈতিক মতবাদের চাপে নাটকের মানবিক সত্য ক্ষুণ্ণ।

সমসাময়িক সমস্যা ও জীবনযন্ত্রণা সমকালীন কাব্যভঙ্গির মাধ্যমে রূপায়িত করার আধুনিক কাব্যনাটকোচিত সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে এই কথাই প্রমাণিত যে আধুনিক কাব্যনাটক এখনও অনিশ্চয়তা ও সংশয়ে বিড়ম্বিত। সেক্স্পীয়রের অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যনাটক নাট্যকলার ইতিহাসে কোনো বিশেষ ভূমিকা সৃষ্টি করতে পারে নি। আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনের যন্ত্রণা ও সমস্যা উপন্যাসেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট, যেমন রেনেসাস্ মূল্যবোধ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সার্থক প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল নাটকে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে উপন্যাসই প্রধান জনপ্রিয় শিল্পরূপ হিসেবে পরিগণিত। আজকের নাটক তাই উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। আধুনিক নাটকের সমস্যা হলো মধ্যবিত্তজীবনের সংগ্রাম ও যন্ত্রণাকে প্রকাশ করে সমসাময়িক মূল্যবোধের ইঙ্গিত প্রদান। বাস্তবধর্মী নাটকে মধ্যবিত্তজীবনের ট্রাজেডি ও কমেডি উপন্যাসের সরসতা ও স্বচ্ছন্দতালাভে সমর্থ। প্রায় সমস্ত আধুনিক কাব্যনাটকই ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে। ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়বস্তুর প্রতি কাব্যনাট্যকারদের অনীহা কাব্যনাটকের দীনতারই দ্যোতক। এ্যানি রিডলাল-এর 'দি শ্যাডোয়ী ফ্যাক্টরী'

(The Shadowy Factory) নাটকে আধুনিক সভ্যতায় লালিত মানুষ কিরূপে বিজ্ঞান বা যন্ত্রের দ্বারা মথিত তা দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই নাটকের শেষেও আধ্যাত্মিক সুরটি পরিস্ফুট। নাট্যকারের মতে মানুষের মুক্তি সাধিত হবে খ্রীষ্টীয় কারুণ্যে! এবংবিধ সরলীকরণ শিল্পমাধ্যমের বাস্তব জীবনঘটিত সমস্যা সমাধানের পক্ষে অনুকূল নয়।

এবং কয়েকটি নাটকের মঞ্চসাফল্যও কাব্যনাটক শিল্পের সার্থকতার পরিচয় নয়। কোনো বিশেষ শিল্প প্রয়াসের সার্থকতা নির্ভর করে তার ঐতিহাসিক ভূমিকায়। ইবসেন, চেখভ, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ যে নাট্যকলার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, কাব্যনাটক সেই ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে স্বকীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। এই ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সমালোচনা-সাহিত্য ও মঞ্চের সহযোগিতা। শ, উইলিয়ম আর্চার ও জি, টি, গ্রীন প্রমুখ বাস্তববাদীদের সমালোচনা ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠা ইংলণ্ডে প্রকৃতিবাদী নাটকের প্রচারে প্রভূত সহায়তা করে। গ্রুপ থিয়েটারের পর একমাত্র মার্কারী থিয়েটারের আনুকূল্যে এলিয়ট, ফ্রাই ও রোনাল্ড ডানকানের নাটক মঞ্চস্থ হয়।

তৃতীয়ত, ভাষা দিয়েই কেবল কবিতা হয় না। ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও কবিতার প্রতিভাস সৃষ্টি করতে পারে এমন সংস্থানকৌশলের প্রয়োজন। ইয়েট্স্ ও এলিয়ট তাই কাব্যনাটকের উপাদান খুঁজেছেন পুরাণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। গ্রীক পুরাণ ও খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানের নবরূপায়ণের চেষ্টা এলিয়টের কাব্যনাটকে প্রতীয়মান। এলিয়টের কাব্যনাটকগুলির ধারাবাহিক আলোচনায় একথাই পরিস্ফুট যে একালে কোনো পুরাণের উজ্জীবন কষ্টসাধ্য। আধুনিক মানুষ ও আধুনিক মঞ্চকলার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরাণের নবসৃষ্টি দুরূহ। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার জীবন পুরাণসৃষ্টিতে অসমর্থ বলেই আধুনিক সাহিত্যে শাশ্বতমূল্যে অন্বিত ট্রাজেডি রচনা প্রায় অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে আমরা স্পেনের বিখ্যাত নাট্যকার লরকার কাব্যনাট্যের উল্লেখ করতে পারি। লরকার 'ডন পেরলিম্পলিন' নাটকটির মধ্যে পৌরাণিক গুণ অতি স্বাভাবিকভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। গল্পাংশকে স্পষ্ট পুরাণকথা না বললেও লরকা তাঁর কবিদৃষ্টির সাহায্যে এর পৌরাণিক গুণকে উদ্ভাসিত করেছেন এবং এর চরিত্রগুলি ঐতিহ্যনির্ভর আচার অনুষ্ঠানের

মাধ্যমে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'দি হাউস অব বেরনার্ডা আলবা' সমকালীন স্পেনদেশের জীবনযাত্রার একটি শক্তিশালী রূপায়ণ। লরকার নাটকের বৈশিষ্ট্য তাঁর স্বদেশীয় সংস্কৃতির উপাদানের মধ্যেই নিহিত। এই প্রসঙ্গেই নতুন ভাবে স্মরণীয় যে আধুনিক ছিন্নমূল জীবনে ঐতিহ্যনির্ভর সংস্কৃতির উপর নির্ভর করা কোনো শিল্পীর পক্ষেই কষ্টকর। আধুনিক কাব্যনাটকের মূল সমস্যা তো শেষ বিচারে এখানেই লক্ষ্য করা যায়। দ্বন্দ্ব সংঘাত জর্জরিত বাস্তব জীবনোৎসারিত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত না হলে শুধুমাত্র কোনও পুরাণ, বর্ণাঢ্য সংস্কৃতিতে নাটক ও কবিতাকে দ্বৈতাদ্বৈত সমগ্রতায় বাঁধা যায় না, এমন কি কোনও আপাতনিরাপদ প্রচণ্ড আস্তিক্য-বোধের সংহতিতেও নয়, এলিয়ট বা ফ্রাইয়ের কুশলী মঞ্চসফল অথচ কোনও প্রাণময় ঐতিহ্য নির্মাণে ব্যর্থ কাব্যনাটকই বোধহয় তার উদাহরণ।

ভ্রম সংশোধন

মুদ্রণ প্রমাদ বশে চৈত্র সংখ্যায় 'বোদল্যার এবং বোদল্যার-কাব্যের অনুবাদ' প্রবন্ধে (৮৮৩ পৃঃ দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ) জর্জ সাঁদ স্থলে জর্জ সাদ্ ও কমেদি ফ্রাঁসেজ স্থলে কমেদি ফ্রাসেজ ছাপা হয়েছে।

চৈত্র সংখ্যার 'সংস্কৃতি-সংবাদ'-এর লেখক জানিয়েছেন তাঁর অনবধানতা-বশত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' চলচ্চিত্রের স্বরস্রষ্টা হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের স্থলে সত্যজিৎ রায়ের নাম প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি জানিয়েছেন 'মানিক' চলচ্চিত্রের পরিচালক হিসেবে বিজলীবরণ সেনের নামই বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, শ্রীশম্ভু মিত্রের নয়। এক্ষেত্রেও অনবধানতাবশত ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং সেই সঙ্গে জানিয়েছেন 'চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থা'র এই চিত্রে শ্রীশম্ভু মিত্রকে নিছক অভিনেতা হিসেবে দেখা তাঁর পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় নি বলেই এমন ভুল ঘটে গেছে। কিন্তু সে যাই হোক, তথ্য হিসেবে এটি ভুল।

শ্রীশম্ভু মিত্রও একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন 'মানিক' চলচ্চিত্রের পরিচালক তিনি নন।

সম্পাদক

"উপলব্ধি" ও সত্য

'পরিচয়'-এর ফাল্গুন সংখ্যায় 'সংস্কৃতি-সংবাদ' প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার মহাশয় লিখিত 'ক্যাজুয়েলটি' অংশ আমার নজরে পড়ে, কিন্তু এই সুবাদে আমার মতো অক্ষমেরও দু-চার কথা বলার প্রয়োজন হবে তা চৈত্র সংখ্যায় শম্ভুবাবুর চিঠি পড়ার আগে উপলব্ধি করি নি। প্রয়োজন একেবারেই হতো না, যদি না শম্ভুবাবু কথাপ্রসঙ্গে আমার স্বর্গগত পিতা ৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করেতন।

তিনি বলেছেন আমার পিতা নাকি শম্ভুবাবুরই মতো গণনাট্য সঙ্ঘে "কাজ করতে পারেন নি", অর্থাৎ তা থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। কথাটা শুধু ভুল নয়, সর্বৈব মিথ্যা। কোনও সংগঠনে "কাজ করতে হলে" নিয়মিত ও ধারাবাহিক নানা খুঁটিনাটিসহ তার কর্মসূচী অনুসরণের প্রয়োজন, যার ফলে কেউ 'কর্মী' হয়ে ওঠেন। সেই অর্থে আমার পিতা কোনও দিনই গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, যেমন বহুরূপীর সঙ্গেও ছিলেন না। কিন্তু যদি সমর্থনের প্রশ্ন আসে—সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে, মাঝে মধ্যে নাটকে অংশগ্রহণ করে, সর্বব্যাপারে উপদেশ পরামর্শ দিয়ে যদি প্রশ্ন আসে সহায়তার—তাহলে আমার পিতার অন্তর উন্মুক্ত ছিল গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতি। শুধু গণনাট্য সঙ্ঘ কেন, যে কোনও 'প্রগতিধর্মী' সংস্থা—সে নাটুকে সংস্থাই হোক, বা ভিন্ন কিছুরই হোক—আমার পিতা আমৃত্যু ছিলেন তারই পক্ষে।

এর বড় কারণ আমার পিতা পেশাদারী নট হলেও, অল্প বয়েসেই দেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পরিণত কালে সমাজজীবন সম্বন্ধে বিশিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। এই মতবাদ ও দর্শনে বিশ্বাসই তাঁকে গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে একাত্ম করেছিল। মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি সেই মতবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। তাই গণনাট্য সঙ্ঘের ব্যর্থতায় তিনি ব্যথিত হতেন, আর তার সাফল্যে অকৃত্রিম উৎসাহ বোধ করতেন। বহুরূপী সম্পর্কে তাঁর আকর্ষণের কারণও এই একই আশা, একই আকাঙ্ক্ষা, নতুন কিছু করার একই প্রেরণা। শম্ভুবাবু

সম্বন্ধে পুত্রস্নেহ মাঝে মধ্যে ওঁকে বহুরূপীর দুর্বলতা সম্বন্ধে অন্ধ করেছিল মাত্র। বহুরূপীর সভাপতিত্ব, নাটকে অংশ গ্রহণ ও কর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যে তিনি ভালোবাসতেন—তার কারণ শুধুই "নাটক করা" নয়; সমাজজীবন বিবর্তনে নট-নাট্যকার-মঞ্চশিল্পীদের করণীয় আছে, প্রগতির বাহক হিসেবে নাটকের আছে ঐতিহাসিক ভূমিকা ও কর্তব্য—এই বিশ্বাস। বহুরূপী সেই প্রয়াসে দৃঢ়সঙ্কল্প—এমন আশাও তিনি করতেন। গণনাট্য সঙ্ঘ, বহুরূপী, লিটল থিয়েটার ও নাট্য আন্দোলনের এমনি ধারা অনেক প্রয়াসকেই তাই তিনি আশীর্বাদ করতেন। তাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করতেন। মতানৈক্যের অবকাশ তিনি অস্বীকার করতেন না, কিন্তু মতাদর্শের বিচ্যুতি তিনি ঘৃণা করতেন। তাঁর জীবনে এর বহু প্রমাণ তিনি রেখেছেন। আজকের দিনে কংগ্রেসী নির্বাচনে অংশগ্রহণ তাঁর কাছে হতো আদর্শচ্যুতি, কবীরের নির্বাচনী সভায় হুমায়ুনী কবিতা পরিবেশন হতো নেহাতই ব্যবসা। কলিযুগে ঋষিদের দূরদৃষ্টিও কত ক্ষীণ! 'বহুরূপী' নামকরণের সময় 'মহর্ষি'ও এই রূপের কল্পনা করতে পারেন নি!

আমার পিতা পরলোকে বিশ্বাসী ছিলেন না। মৃত্যুর পরও অতৃপ্ত আত্মার বিচরণ তিনি হাস্যকর মনে করতেন। তাঁর অনেক বিশ্বাসই জীবনে ভেঙে চুরমার হয়েছে। কিন্তু আজ শুধু কামনা করি তাঁর এই বিশ্বাস যেন সত্য থাকে। নচেৎ সেই মহান-আত্মার আক্ষেপ-কল্পনা মর্মস্পর্শী!

নরনারায়ণ ভট্টাচার্য

সংস্কৃতি সংবাদ

ঋষিঋণ

কবি যে ঋষি, তাও আমাদের শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্রের অনেক কথা অপেক্ষা এ কথাটি অধিক সত্য। এই ঋষিঋণ অপরিশোধ্য। রবীন্দ্রনাথের নিকট আমাদের যে ঋণ তাকে নিঃসন্দেহে বলতে পারি ঋষিঋণ—তা স্বীকারের মধ্য দিয়েই আমরা তার ফলভাগী হই। এই ঋষিঋণ আমরা যতই সচেতন মনে গ্রহণ করি ততই তা ঋণ থেকে আমাদের অর্জনে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। এইজন্যই রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসব পালনের ওপরে আমরা বৎসরাধিক কাল থেকে এত গুরুত্ব দিয়ে এসেছি—অনুপার্জিত উত্তরাধিকার সৃজনশীল নব নব সম্পদের উৎস হোক। সেই শতবর্ষপূর্তির উৎসবকাল এবার শেষ হলো। একবার এই বর্ষকালের উদ্যোগ-আয়োজন, সমগ্রভাবে এই ঋষিঋণোপলব্ধির প্রয়াসকে বুঝে দেখা দরকার। তার মধ্য দিয়ে হয়তো আমাদের আজকের জীবনের ও চেতনার একটা পরিচয়ও লাভ করা যায়।

উৎসব-ইতিহাস

বলাই বাহুল্য, দেশের ও বিদেশের বিচিত্র আয়োজনের সংবাদ রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। জানি না, বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের পক্ষেও তা সম্ভব হয়েছে কিনা। হয়তো অধিকাংশ আয়োজনের সংবাদ তাঁদের নিকট পৌঁছে থাকবে; এবং তার একটা হিসাব প্রণয়নের মতো সংগঠনও তাঁদের পক্ষে অসাধ্য নয়। অন্তত তা তাঁদেরই প্রথম কর্তব্য। সেই সঙ্গে আমরা আশা করব শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রবীন্দ্র-তথ্যের ভাণ্ডারী ও কাণ্ডারীরা (যাঁরা এতদিন একক ভাবেই আপন ব্রত উদ্‌যাপন করে এসেছেন এবং আজ দেশও সে কারণে যাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে কুণ্ঠিত নয়) নিজেদেরই প্রেরণায় যথাসম্ভব এই শতবার্ষিক উৎসবের একটা তথ্যপঞ্জী সংগ্রহ ও সঙ্কলিত করে যাবেন।

এই উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত অজস্র পত্র-পত্রিকা, বিজ্ঞপ্তি, অনুষ্ঠানলিপি বা কর্মসূচী হয়তো কোনো স্মারণিক ভাণ্ডারে রক্ষিত হবে না, কিন্তু নিশ্চয়ই তার মধ্যে অনেক বস্তুই সংরক্ষণীয় ; অনেক বিশেষ সঙ্কলন, বিশেষ প্রকাশন, গ্রন্থ, শিল্পপরিচয়, ফটোগ্রাফ, গানের রেকর্ড, অভিনয়ের টেপ-রেকর্ডিং (যেখানে তা গৃহীত হয়েছে) ইত্যাদি। বাঙলাদেশের প্রধান দৈনিকপত্রগুলি নিজ নিজ পাতা থেকে এই বর্ষব্যাপী উৎসবসমূহের একটি সার-সঙ্কলন প্রকাশ করে নিজেদের কবিপূজার অর্ঘ্যটিকে স্থায়ী করে রাখতে পারেন। এ কি অসম্ভব প্রত্যাশা ?

সমসাময়িক সাংস্কৃতিক চেতনার ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এরূপ প্রমাণ আরএক শতবর্ষপূর্তির দিনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস্য ও আলোচ্য হবে।

কাজটি অবশ্য সুসাধ্য নয়। প্রথমত, পৃথিবীব্যাপী এমন কবিপূজার আয়োজন ইতিপূর্বে বেশি হয় নি—হওয়া সম্ভবও ছিল না। মানুষ এমন করে মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছে এ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও বৈষয়িক-রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ফলে। আর, এই মানবিকী চেতনার উদার সাক্ষ্য এ যুগের যেসব মনীষী বহন করেছেন, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মনীষায় অসামান্য এবং কবি হিসাবে অদ্বিতীয়।

রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এখনো সর্বত্র সুস্থির হয় নি, সর্ব ক্ষেত্রে অকুণ্ঠিতও নয় তাঁর স্বীকৃতি, তাও আমরা জানি। কিন্তু তাঁর এই খ্যাতি পৃথিবীতে ব্যাপক ও সুদৃঢ় : এক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিংশ শতকের একজন প্রধান কবি ; এবং দুই, মানুষের ইতিহাসে মানবিকবোধের তিনি একজন প্রধান পুরোধা। 'লণ্ডন টাইমস্'-এর ইংরেজ পত্রকারের পক্ষে রবীন্দ্র-উৎসবের উৎসাহ একটা বক্রোক্তির বিষয়। ব্রিটিশ বেতারের (বি. বি. সি) বৈদেশিকী সংস্কৃতি-পরিচায়কদের নিকট তা আধঘণ্টার অধিক কালক্ষয়ের অনুপযোগী। মার্কিন 'লাইফ' বা 'নিউইয়র্ক টাইম্স্' প্রভৃতি পত্র রবীন্দ্রনাথের নামে অজ্ঞের বিরূপবুদ্ধির অবকাশ রচনা করেই পরিতৃপ্ত। তাদের এমন সদ্দৃষ্টান্তের অনুপ্রেরণায় এদেশেরও মানুষ কেউ-কেউ নিজেদের যথেষ্ট 'স্মার্ট' এবং বোদ্ধা বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হবেন, তা হতেই পারে না। কিন্তু যা পরিষ্কার তা এই—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নীরব থাকা তাদেরও পক্ষে সম্ভব হয় নি যারা রবীন্দ্রনাথকে বিস্মৃত হতে চায়। রবীন্দ্রনাথ যাঁদের কাছে মানবতাবোধের জন্য অস্বস্তিকর, কবিকৃতির জন্য অপরাহত। মানুষের

কবি, মানুষের বন্ধু রূপে রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর মানুষ গ্রহণ করেছে—এই শতবার্ষিকপূর্তি উৎসবে আমরা তার সাক্ষ্য দেখেছি।

বৈদেশিক আয়োজন

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ বর্ষের উৎসব দেশেদেশে যে বিচিত্র আয়োজনে পালিত হয়েছে, তার সম্পূর্ণ হিসাব আমরা দিতে অক্ষম। অনেক তথ্য এদেশে পৌছয় নি। কোনো কোনো সংবাদ পৌছুলেও তার অর্থ আমরা উপলব্ধি করবার অবকাশ পাই নি। এরূপ সামান্য দু-একটির কথা উল্লেখ করছি: সোভিয়েত দেশের বহু ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্যানুবাদ, রবীন্দ্র-আলোচনা ও বহুবিচিত্র উৎসব আয়োজনের কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু আমরা কি কেউ বুঝে দেখেছি—মস্কোর এ উৎসবের উদ্বোধন হয়েছিল তার সেই 'হল্ অব্ কলাম্স্'-এ—যেখানে সোবিয়েতজীবনের মহত্তম উৎসবই মাত্র অনুষ্ঠিত হয় ? এ ব্যাপারের তাৎপর্য আমাদের জানাবে কে—যখন এ উৎসবে আমাদের কোনো প্রতিনিধি প্রেরণও আমরা প্রয়োজন মনে করি নি। চীনের রবীন্দ্র-উৎসবে অবশ্য প্রতিনিধি প্রেরণ কর্তৃপক্ষের অনভিপ্রেত ছিল। কিন্তু এ কথা উল্লেখের অযোগ্য নয় যে, এ উপলক্ষে চীনাভাষায় ১০ খণ্ডে রবীন্দ্রসাহিত্যানুবাদ যথাসময়ে প্রকাশ করা চীনের রবীন্দ্রানুরাগীদের পক্ষে একটি স্মরণীয় কীর্তি। অথচ বাঙলাদেশে বা ভারতবর্ষে এই কথাটিও কি প্রকাশ অনভিপ্রেত ? এরূপ আচরণ রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করতেন কিনা তা বলবার অধিকারী হয়তো আমরা নই, মন্ত্রীরাই কেহ ; কিন্তু আমরা যতটুকু বুঝি এ-সংবাদ প্রকাশিত হলে ভারতের সীমান্ত-স্বার্থ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতো না। পূর্ব-ইওরোপের কোনো কোনো দেশ রবীন্দ্র-উৎসব কিরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেছে, আর কী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পালন করেছে, তা আমাদের সামান্যভাবে জানবার সুযোগ হয়েছে শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবীর সাক্ষ্যে। যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় তারা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন মানবতার মহাপথিকরূপে—'গোরা'র শেষ পরিচ্ছেদ বা 'দুরাশা'র মতো দীর্ঘ গল্পের অনুবাদ আবৃত্তি করতে তাঁরা তাই অক্লান্ত। পশ্চিম-ইওরোপের উৎসব-বিবরণ এ দেশের সংবাদপত্রে কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই এই ভারতীয় সাংবাদিকরাই ছিলেন সেসব উৎসবের উদ্যোক্তা ; আর তাঁদের সহায়ক ছিলেন ডেম্ সিবিল থর্নডকাই

প্রমুখ বয়োবৃদ্ধ রবীন্দ্রসুহৃদ শিল্পী ও মনস্বীরা। মার্কিন দেশেও রবীন্দ্র-উৎসব পালনের সকল তথ্য আমরা পাই নি—বহু গোষ্ঠীই তাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মন্ত্রীবর হুমায়ুন কবীরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'টুয়ার্ডস্ ইউনিভার্সাল ম্যান' (Towards Universal Man) বা শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্কলিত 'এ টাগোর রীডার' (A Tagore Reader) নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসুদের কতকাংশে তৃপ্ত করেছে। নিউ ইয়র্কে মিঃ লেভেন্থাল হ্যারলড আয়োজিত 'কিং অব দি ডার্ক চেম্বার'-এর (রাজা) অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল শুনেছি। আরবমণ্ডলে ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে উৎসবের সংবাদ কোথাও সংগৃহীত হয় নি—অনেক দেশেই রবীন্দ্রনাথ এখনো স্মরণীয় অতিথি, নিশ্চয়ই স্মৃতি-উৎসবও হয়ে থাকবে।

ভারতীয় আয়োজন

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের এ উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থাদি কিম্বা গীত, গান বা অভিনয়াদির কথা আমরা বিস্মৃত হতে চাই না। সেসব বিবরণ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল এখনো বহুপরিমাণে অতৃপ্ত। কিন্তু ভারতবর্ষের বহু রাজ্যে যে অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়েছে, আমরা তারও তথ্য প্রায়ই জানি না। নিঃ ভাঃ বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের বোম্বাই উৎসব ও গত পৌষ মাসের কলিকাতা (জোড়াসাঁকোর) অনুষ্ঠান দুটির কথা, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের কথা (উদ্বোধন আলোচনা-সভা) মোটামুটি জানা গিয়েছে। পাটনা প্রভৃতি কোনো কোনো স্থানে যেরূপ সমারোহে উৎসব পালিত হয়েছে, তার সমস্ত তথ্য তবু আমরা জানি না। আর উৎসব তো শুধু একবারে পালিত হয় নি—যথারীতি সভা ছাড়াও গীতে-গানে, নৃত্যে-অভিনয়ে, চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রায় প্রত্যেকটি বৃহৎ ভারতীয় শহরই রবীন্দ্র-উৎসব পালন করেছে। কোনো কোনো আয়োজন শ্রদ্ধায়, ঐকান্তিকতায়, শিল্পবোধের শ্রীতে, আলোচনার উচ্চমানে সত্যই স্মরণীয়। কিন্তু বিশ্বভারতীয় উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বাঙলা সাহিত্যসম্মেলন ও শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবার সম্মেলনে আমরা উপস্থিত থেকে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেছি। আলোচনা-সভা ও সঙ্গীতসম্মেলনও সুনির্বাহিত হয়ে থাকবে। বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শ ও রবীন্দ্রশিক্ষাপদ্ধতি কিরূপে অব্যাহত রাখবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। অন্তত মাতৃভাষার স্থলে ইংরেজির মাধ্যম যখন এখনি

অনুসৃত হচ্ছে, তখন আশ্বস্ত বোধ করবার কারণ দেখি না। কিন্তু শতবর্ষপূর্তি উৎসবের অনুষ্ঠান কয়টি সেখানে সযত্নে পালিত হয়েছে, এটি নিশ্চয়ই আনন্দের কথা; কর্মীরা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

বিশ্বভারতী ও কেন্দ্রীয় (আধা-সরকারী) উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠান-সমূহের অনেকগুলিই সুনির্বাহিত হয়েছে বলে শুনেছি—সকল দিকে শ্রী ও শ্রদ্ধার পরিচয় অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলতে পারলে আরও সুখী হতাম। তা হয় নি, কারণ দেশ-বিদেশের আহূত বক্তারা সকলে সমান শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নন, অধিকারীও নন। নয়াদিল্লীর আলোচনা-মণ্ডলীতে অলডাস্ হাক্সলীর বক্তব্য সত্যই প্রণিধানযোগ্য ছিল। দেশীয়দের কোনো কোনো বক্তৃতা যদিও প্রায়শ নূতনত্ব বর্জিত, তথাপি উপাদেয় হয়েছিল। বিদেশীয় একজন সাহিত্যাভিমানী রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'কাম-প্রস্তাব' লাভেই নাকি যা কিছু তৃপ্তি পেয়েছেন (শুনেছি, তিনি নিজে স্বদেশীয় প্রাচীন কামাখ্যানের ইংরেজি অনুবাদক রূপেই সাহিত্যিক), ভারতীয় একজন সাহিত্যিক এই বক্তব্য ঘোষণাতেই উৎসাহী ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক তরুণ বাঙলা সাহিত্যিকদের সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাগত জানাতে ছিলেন কৃপণ। নিশ্চয়ই অতিথিদের নিজ বক্তব্য নিবেদন করবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অতিথিরা যখন মনোনীত ও আমন্ত্রিত, তখন সংশয় জাগে দিল্লীর এই আমন্ত্রণাধ্যক্ষরা অন্তত দু-এক ক্ষেত্রে বিজ্ঞতার পরিচয় দেন নি। তথাপি প্রশংসনীয় বেতারের উৎসবপালনের প্রয়াস, নৃত্যনাট্যকলা আকাদেমির আয়োজন আর সর্বব্যাপী নানা প্রকাশন।

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ

সরকারী আয়োজিত ব্যবস্থার মধ্যে যদি কোনো একটি জিনিষ আমাদের সর্বান্তঃকরণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করে থাকে তবে তা শ্রীসত্যজিৎ রায় প্রণীত চলচ্চিত্র 'রবীন্দ্রনাথ'। বিরাট ও বহুমুখী জীবনের সকল তথ্য ও সকল তত্ত্ব সমভাবে উল্লেখিত হতে পারে না, এজন্য এ সৃষ্টিতে কে কী পান নি তা খোঁজা আমাদের মতে নিরর্থক। আমাদের বিবেচনায় এ সৃষ্টি অনবদ্য। কারণ, প্রথমত, রবীন্দ্র-জীবনের মূল সত্যকে সত্যজিৎ রায় সৃষ্টির অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আয়ত্ত করেছেন এবং তার চরম লগ্নের পরম রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন; দ্বিতীয়ত, এ সমস্তই করেছেন শুধুমাত্র পূর্ব-উপকরণকে

স্রষ্টার শক্তি দিয়ে আয়ত্ত করে, নির্বাচিত করে, সৃষ্টির পদ্ধতিতে অখণ্ড রসরূপে পরিণতি দান করে; তৃতীয়ত, এই বিশেষ শিল্প-মাধ্যমের শক্তিতে রবীন্দ্র-পরিচয় সার্বজনীন হতে পারল, এবং সার্বকালীনও হতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়, তবু বলা প্রয়োজন—'তিন কন্যা'য় সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের গল্পাবলম্বনে নিজের নতুন সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। স্বভাবতই তাতে তিনি স্বাধীনতাও অবলম্বন করেছেন। আমাদের বিবেচনায়, স্রষ্টার এ স্বাধীনতা গ্রাহ্য এবং রবীন্দ্রগল্পের বা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সে স্বাধীনতা স্বীকার্য যদি তা নতুন সৃষ্টির আশ্রয় হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ রায়ের 'তিনকন্যা' সে গৌরব লাভ করেছে। তথাপি কন্যাকয়টি রবীন্দ্রনাথের মানসকন্যা না থাকায় সকলে এ সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট হন না। 'তিনকন্যা' বাংলা চলচ্চিত্রে একটি নতুন পথের দুয়ার খুলে দিয়েছে—তা চলচ্চিত্রের ছোটগল্প-রচনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে নিজের যোজনায় যারা পুরো একটা ছবিতে রূপায়িত করে কাবুলিওয়ালা প্রভৃতি গল্পের সমস্ত গাঢ়তাকে বিনষ্ট করছে তাদেরকে নিরস্ত করবার কি কোনো উপায় নেই? আজ তো বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান—ঐশ্বর্যে আড়ম্বরে তার বিকার ঘটতে দেরি আছে কিনা জানি না। কিন্তু কোন্ নীতিতে, যুক্তিতে, অধিকারে—রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বাসরক্ষকরা এভাবে সে সাহিত্যকে চলচ্চিত্রে বিকৃত করে অর্থাগম করেন? এর কি কোনো প্রতিবিধান নেই? রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস, নাটক চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবে কি হবে না, তা প্রশ্ন নয়—অর্থবলে তার বিকৃতিসাধন করা যাবে কিনা তাই প্রশ্ন। এ তো ঋষিঋণ স্বীকৃতি নয়—তা দিয়ে শৌণ্ডিকাচরণ—তাই এ শতবার্ষিকী বৎসরে এ প্রসঙ্গে কথাটা আমরা উত্থাপন করলাম। শ্রদ্ধার ব্যবসাও সহ্য হয়, কিন্তু শ্রদ্ধার ব্যভিচার অনুমোদিত হলে তা নিশ্চয়ই অসহনীয়।

পশ্চিম-বাঙলার আয়োজন

কেন্দ্রীয় শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজনের পরেই আলোচ্য পশ্চিম বাঙলার রাজ্য আয়োজন—বিশেষ পশ্চিম-বাঙলার সরকার-চালিত আয়োজন ও অনুষ্ঠানসমূহের কথা। এ সবের পরিকল্পনাকালেই আমরা শৈথিল্যের ও সঙ্কীর্ণতার আভাস দেখেছিলাম—যেমন, সমস্ত উৎসবকে মুষ্টিমেয় মালিক ও কর্মচারীদের কবলিত করে রাখা; লোকসমাজের স্পর্শ বাঁচিয়ে আমলাতন্ত্রী

নেতৃত্বে উৎসব পালন করা; এমন কি, উৎসব-সমিতির সদস্যমণ্ডলীকেও (সভাপতি ও তাঁর মুষ্টিমেয় অনুগত সদস্য ব্যতীত) পরামর্শ, কর্মোদ্যম ও সর্ববিধ আয়োজন থেকে বঞ্চিত রাখা। এ পদ্ধতি শেষপর্যন্তও অব্যাহত ছিল। এরূপ সীমিত ও সঙ্কীর্ণ পরিকল্পনা ও পরিচালনা সত্ত্বেও সে উৎসব যতখানি সার্থক হতে পারে ততখানি সার্থক হয়েছে। তার কারণ বাঙলা দেশের মানুষের কবির প্রতি শ্রদ্ধা, তাদের প্রাণশক্তি ও উৎসাহ সীমাবদ্ধ থাকতে চায় নি। পঁচিশে বৈশাখের পূর্ব থেকেই জাতীয় উৎসবের পরিবেশ বাঙলা দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে—এমন পরিবেশ কোনো দিন কেউ চেষ্টা দ্বারা গড়ে তুলতে পারে না, কোনো স্বৈরতন্ত্রও সর্বাংশে তাকে দমিত করতে পারে না। এ হচ্ছে লোকজীবনের আত্মপ্রকাশ। সে প্রকাশকে যত্নদ্বারা, শ্রদ্ধার সহিত, সঙ্কল্পের সহায়ে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টির যোগে সংগঠিত করলে জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়। বর্তমান বঙ্গে এ সংগঠনশক্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রনেতাদেরই করায়ত্ত। আর তারা এক্ষেত্রে ছিলেন হয় অক্ষম নয় উদাসীন। ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত মেলায়, রবীন্দ্রভারতীর প্রতিষ্ঠা উৎসবে বা জাতীয় গ্রন্থাগারের সভাতেও অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি গোপন থাকে নি। সে সবের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ লজ্জা রাখবার মতো স্থান কোথায় যে, রবীন্দ্রনাথের রাজ্যে একবারও কবির আকাঙ্ক্ষিত সকল গ্রামে জলকষ্ট নিবারণের বা জনশিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ তাঁর রাজ্যসরকার গ্রহণ করলে না? রাজ্যের সমবায়-বিভাগ বিন্দুমাত্র দায়িত্ববোধ করলে না সমবায়-পদ্ধতিকে প্রসারিত করতে, সমবায়ের সাধক রবীন্দ্রনাথকে একবারও এ সময়ে স্মরণ করতে? সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজ্যপ্রয়াস এখনো সার্থকতার অধিকারী হতে পারে যে ক্ষেত্রে তা হচ্ছে—প্রথমত রবীন্দ্রভারতীর আয়োজনে, রবীন্দ্রস্মরণীর সংগঠনে। কোনো কোনো বেসরকারী আয়োজনকেও তাঁরা সাহায্য করেছেন। জেলায় বহু শতবার্ষিকী সঙ্কল্প এখনো অসম্পূর্ণ। সেখানেও এই কর্তৃপক্ষ আরও সহায়তা দান করতে পারেন।

শত শত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মনপ্রাণ দিয়ে এই কবি-পূজার উৎসব পালন করেছে। আমরা পূর্বেই বলেছি, তাঁদের অনুষ্ঠানাদির তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কারণ, সমগ্রভাবে দেখলে আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্বলতা, অসঙ্গতি—সমস্ত শুদ্ধ আর সমস্ত ছাপিয়ে গিয়ে এ উপলক্ষে

জাতির যে প্রকাশ আমরা দেখেছি তাতে বারে বারে মনে হয়েছে— "অল্ ইজ নট্ লস্ট।" এ আশা কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে পাওয়া যেতে পারত না—পাওয়া গিয়েছে নামহীন-খ্যাতিহীন বাঙালী নরনারীর স্বতঃউৎসারিত প্রাণানন্দে, অকপট শ্রদ্ধা নিবেদনে, অনায়াস আত্মনিয়ন্ত্রণে। 'রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তি উৎসব'-এর আয়োজিত রবীন্দ্রমেলায় আমরা বারে বারে অনুভব করেছি—বাঙালী নরনারী রবীন্দ্র-উৎসব পালন কামনা করে ; কী তাঁদের প্রাণের সম্পদ, বুদ্ধিগ্রাহ্য আলোচনায় আগ্রহ। আর, সর্বাধিক বিস্ময়—কী স্বচ্ছন্দ তাঁদের শৃঙ্খলাজ্ঞান, সহজাত তাঁদের সংযম, আন্তরিক তাঁদের মানবমূল্যবোধ। 'পরিচয়'-এর কর্তৃপক্ষ সে উৎসবের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ; সেই উৎসব-প্রসঙ্গ থেকে আমরা তাই বিরত থাকছি। কিন্তু শতবার্ষিকী উপলক্ষে পল্লীমঙ্গলের কর্মীদের আমতার পাড়াগাঁয়ে দেখেছি নীরবে রবীন্দ্রাদর্শে পল্লীসেবার চেষ্টা। তমলুকের সন্নিকটে কৃষকসম্মেলনে দেখেছি রাতজেগে নরনারীর রবীন্দ্রনাথের কথা শুনবার আগ্রহ। বাঙলাদেশের শিল্পাঞ্চলের বহু ক্ষেত্রে দেখেছি কারখানার শ্রমিকদের কবির কথা শুনবার অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা। যা দেখেছি তাতে বারে বারে মনে হয়েছে বাঙালীর সব এখনো শেষ হয় নি। কিন্তু যা শেষ হয় নি তা বাঁচিয়ে রাখবার মতো সুবুদ্ধি কোথায়, সঙ্কল্প কোথায়, আয়োজন কোথায় ?

বিশিষ্ট প্রকাশন : ইংরেজি

এ বৎসরের বহু অনুষ্ঠানই এখন সমাপ্ত হয়েছে, তা এখন বিস্মৃতির পথে। একমাত্র যা কোনোরূপে মুদ্রিত বা চিত্রে বা রেকর্ডে বিধৃতি, তাই কবিপূজার কতকটা সাক্ষ্য বহন করবে। সে সব স্মারক গ্রন্থ ও বিবরণীর বা রেকর্ডের বা ফটোগ্রাফসমূহের বিবরণ কেউ প্রকাশ করলেও জনসাধারণ একটু আত্মাবলোকনের ও আত্মপরীক্ষার সুযোগ লাভ করবে। আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের সম্মুখস্থ কয়েকখানি গ্রন্থ ও সঙ্কলনের দিকে আমরা সেই উদ্দেশ্যে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছি। তা শতাংশের একাংশ মাত্র, বিচিত্রের আভাস স্বরূপ।

রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের যে আয়োজন এ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে হয়েছে, তাই সর্বাধিক স্মরণীয়। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে 'বিচিত্রা',

'ছিন্নপত্রাবলী' প্রভৃতি যে সব গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে, আমরা তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের পল্লীমঙ্গল বিষয়ক প্রবন্ধ, ভাষণ, চিঠিপত্র একত্র সঙ্কলিত হয়ে 'পল্লীপ্রকৃতি' নামে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তো এরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন বিশেষ অনুভব করেছি, এখন তা লাভ করে সকলেই আনন্দিত হবেন। অবশ্য 'রবীন্দ্ররচনাবলী'র যে সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে, তা, 'বিচিত্রা'র পরেই, একদিক থেকে এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ আয়োজন। সে সম্বন্ধে সাধারণের কিছু অসন্তোষ আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রারব্ধ কর্মের মধ্যে সবচেয়ে এই প্রকাশনটিই শ্রেষ্ঠ প্রয়াস— এজন্য তাঁরা প্রশংসার্হ। তা নির্দোষ হোক, আমরা এই কামনা করি। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গ্রন্থসমূহেরও সংস্করণ এ উপলক্ষে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল, কিন্তু যে কারণেই হোক, কোনো কোনো ইংরেজি গ্রন্থ (ইংরেজি 'সাধনা', 'পার্সোনালিটি', 'ন্যাশনালিজম্' প্রভৃতি) এখনো বাজারে দুষ্প্রাপ্য। অবশ্য মার্কিন মুলুকের ইংরেজিভাষীদের জন্য শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্কলন 'ঠাকুর-সঙ্কলন' ('A Tagore Reader') এবং শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীরের সঙ্কলন 'বিশ্বমানবের উদ্দেশে' ('Towards Universal Man': ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ গ্রন্থের লেখাসমূহ নির্বাচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত) এই দু-খানা গ্রন্থই রবীন্দ্রনাথের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কয়েকটি বিশিষ্ট লেখা সযত্নে উপস্থাপিত করেছে। সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় তাতে পাওয়া যায় কিনা, তা ইংরেজিবেত্তারা বুঝবেন, কিন্তু সৃজনীচিন্তার যথাসম্ভব সুনিবদ্ধ সাক্ষ্য দুখানা বইতেই পাওয়া যাবে ; তবে অ-বাঙালী ভারতীয়দের পক্ষে নিশ্চয়ই এসব ইংরেজি সঙ্কলন দুর্মূল্য ও তাই দুর্লভ—অবশ্য সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারসমূহ হুমায়ুন কবীর সাহেবের সঙ্কলন নিশ্চয়ই ক্রয় করবেন। ভারতীয়-অভারতীয় সাধারণ ইংরেজি পাঠকদের পক্ষে যে সঙ্কলন সুলভ হতো তা একটু স্বতন্ত্র ধরনের এবং দুর্ভাগ্যক্রমে খণ্ডিতাকারে তা প্রকাশিত। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তি উৎসব কমিটি সঙ্কলিত গ্রন্থে ('Tagore & Man', আড়াই টাকা) রবীন্দ্রনাথের মানবতার দিকটিকেই আশ্রয় করে কালানুক্রমে তাঁর ভাবনাকে উপস্থিত করতে চেয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বিনালাভে এবং তাই স্বল্পমূল্যে, অ-বাঙালী দেশী-বিদেশী সকল পাঠকের নিকট রবীন্দ্রনাথের মূল জীবনদৃষ্টি স্থাপন করা। বিলাতের ম্যাকমিলান কোম্পানি সম্পাদকদের নামমাত্র

দক্ষিণায় তাঁদের স্বত্বাধিকৃত ইংরেজি লেখা সঙ্কলন করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্য সমুদায় লেখার স্বত্বাধিকার যাঁদের, বিশ্বভারতীর সেই স্বদেশীয় কর্তাদের অনুমোদন শেষমুহূর্তেও এ সঙ্কলনের জন্য লাভ করা গেল না। সঙ্কলনের সম্পাদকবর্গ জানিয়েছেন—এই স্বদেশীয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্বত্বাধিকারীরা স্থির করেছেন—যেহেতু 'বিচিত্রা' প্রভৃতি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে অতএব ওরূপ ('Tagore & Man') সঙ্কলনের প্রয়োজন নেই। এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে মানতে হবে—এ যুক্তি নয়, চক্রান্ত ; এবং চক্রান্ত কোনো বিশেষ সম্পাদনার বিরুদ্ধে হলেও, আসলে চক্রান্ত বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্রসাহিত্যের জিজ্ঞাসুদের বিরুদ্ধে, এবং রবীন্দ্রনাথেরও বিরুদ্ধে। আর কিছু না হোক, এই সঙ্কলন ইংরেজি পাঠকদের জন্য, আর 'বিচিত্রা' প্রভৃতি যতদূর বুঝি, বাঙলায় বাঙালীর জন্য কবির লেখার সঙ্কলন। শুনেছি, রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বত্বাধিকার এসব কর্তৃপক্ষের আইনানুযায়ী আছে কিনা, তাও নাকি অনিশ্চিত। কিন্তু সে তো সুদূর প্রশ্ন। আর এ কর্তৃপক্ষ তো তা কথনো বলেন না। আপাতত যে অ-বাঙালীর জন্য স্বল্পমূল্যে রবীন্দ্রচিন্তা সঙ্কলনের চেষ্টা পণ্ড হয়েছে, ঐ কর্তৃপক্ষেরই তা সম্পূর্ণ কৃতিত্ব। আর, কৃতিত্ব এখানেই শেষ হয় নি—একটি সুন্দর ইংরেজি (অনুবাদও) সঙ্কলনগ্রন্থ আমাদের সম্মুখেই রয়েছে—ডান্‌লপ কোম্পানি-প্রকাশিত 'পথিক রবীন্দ্রনাথ' (The Wayfaring Poet) ; রবীন্দ্র-সাহিত্যের জবরদখলী (?) কর্তৃপক্ষ তো নগদ রজতমূল্যেই এ সঙ্কলনের অনুমতি ডান্‌লপ কোম্পানিকে দিয়েছেন জানি, সে কি প্রবঞ্চনা? খণ্ডিতাকারে প্রকাশিত 'Tagore & Man' তথাপি অ-বাঙালী ইংরেজি-পাঠকদের পক্ষে একটি সুলভ, সুনির্বাচিত ও বিশেষ কার্যকর সঙ্কলন। ডান্‌লপ কোম্পানির সঙ্কলনটি দুর্লভ, কারণ তা বিক্রয়ার্থ নয়। এ প্রকাশনীটিতে যাত্রী রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় লাভ করা যায় তাতেও বিশ্ব-পথিক রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ। অংশের মধ্যেও সমুদায়ের আভাস সুনিশ্চিত হয়েছে সম্পাদনার সৌকর্যে। লেখা-নির্বাচন, চিত্র-মুদ্রণ প্রভৃতিতে রুচির ও যত্নের পরিচয়ও আনন্দদায়ক। বিদেশীয় ফোর্ড ফাউণ্ডেশন বা ডান্‌লপ কোম্পানি যে বুদ্ধির উৎকর্ষ এ ব্যাপারে দেখিয়েছেন তা কি স্বদেশীয় ধনিক প্রতিষ্ঠান দেখাতে পারতেন না? তাঁরাও উৎসব করেছেন, নিশ্চয় অর্থব্যয়ও করেছেন, কিন্তু সুচিন্তিত কিছু নিদর্শন রাখতে পেরেছেন কয়টি প্রতিষ্ঠান?

রবীন্দ্র-রচনা সঙ্কলন ক্ষেত্রে টাটা কোম্পানি প্রকাশিত রবীন্দ্র-চিত্রাবলী (Twelve Paintings of Rabindranath Tagore : আট টাকা) নিশ্চয়ই দেশীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রশংসনীয় কাজ। আমরা পূর্বেও ঐ প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেছি। দাম আট টাকা—দুর্মূল্য নয়। মাত্র ১২খানা হলেও এ ছবির নির্বাচনে, মুদ্রণে ও পরিচয়-সূত্রে রুচি ও বুদ্ধির প্রমাণ সুন্দর। অবশ্য, রবীন্দ্রচিত্রকলার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তর থেকে প্রকাশিত পোর্টফোলিও-অ্যাল্‌বাম্‌ (Thirty-seven Paintings of Rabindranath Tagore) দুর্লভ সামগ্রী—জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রদর্শনীতে সাধারণ সেই চিত্রাবলীর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছেন। শুনেছি মাত্র দুশো-আড়াইশো অ্যাল্‌বাম্‌ মুদ্রিত হয়েছে, প্রতিখণ্ডের দাম পনেরোশত-ষোলশত টাকা, মুদ্রণে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মূলের সমস্ত বিশ্বস্ততা রক্ষিত হয়েছে ; আর তাই কালক্রমে মূলের ক্ষতি হলেও এ প্রতিলিপি থাকবে। সেদিক থেকে এ অ্যালবাম শুধু মূল্যবান নয়, অমূল্য। একটি পৃষ্ঠায় ছবিগুলোর তালিকা, পরিচয়-সূত্র, জন্মতারিখ প্রভৃতি উল্লেখ করা তবু আবশ্যক ছিল। দ্বিতীয় মূল্যবান ললিতকলা একাদেমির অ্যালবাম (Drawings and Paintings of Rabindranath Tagore, পঁচিশ টাকা)। শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ নিয়োগীর পরিচয়-নিবন্ধ শুদ্ধ, চল্লিশখানি সুমুদ্রিত, সুনির্বাচিত ছবি—এ প্রয়াসের প্রশংসা আমরা পূর্বেও করেছি—সুলভ না হলেও এ অ্যালবামকে দুর্মূল্য বলা যায় না।

এ প্রসঙ্গেই সঙ্গীত-নাটক-একাদেমির সম্প্রতি-প্রকাশিত বুলেটিন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore, Centenary Number)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। এখানি চিত্র-প্রকাশন নয়, তবে আটখানি (রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র প্রমুখের) চিত্রে, রবীন্দ্রাভিনয়ের আলোকচিত্রে ও তিনখানা পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিতে এ সংখ্যার গৌরব বর্ধিত হয়েছে। আর, রবীন্দ্রনাথের নিজের লিখিত ও সঙ্গীত ও নাট্যকলা বিষয়ে ইন্দিরা দেবী, বাকে, প্রতিমা ঠাকুর প্রমুখ অন্যান্যদের পূর্বলিখিত ১৫টি লেখার প্রকাশনই এই সংখ্যাটির আসল উদ্দেশ্য—একসঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ও রবীন্দ্র-নাট্যের সম্বন্ধে যা প্রামাণিক ও সমসাময়িক রসিকদের বক্তব্য তা এভাবে লাভ করে সকলেই কৃতার্থ হবেন। সম্পাদক ও উদ্যোক্তাদের সুবিবেচিত নির্বাচন,

মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জার সহজ শ্রীও প্রশংসনীয়। (ললিতকলা একাদেমি—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামেও একটি চমৎকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। তা স্বতন্ত্র আলোচ্য)।

যদি ইংরেজিতে প্রকাশ্য গ্রন্থের কথাই বলতে হয়, তা হলে মুক্তকণ্ঠে বলতে হবে সাহিত্য একাদেমি প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore—A Centenary Volume 1861-1961, ত্রিশ টাকা) আমাদের আশঙ্কাকে দূর করেছে, আশা সার্থক করেছে। এ সুবৃহৎ (৫৩১ পৃষ্ঠার), সুমুদ্রিত, চমৎকার চিত্র (১০+৫) সম্বলিত, বহু প্রবন্ধে ও তথ্যে (৫৬+২+২) সমালঙ্কৃত গ্রন্থ নিয়ে আমরা পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়াতে পারছি, লজ্জাবোধ করবার কারণ দেখছি না—সম্ভবত সাহিত্য একাদেমিকে এই বলে সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে যে সম্পাদকমণ্ডলী এ গ্রন্থের লেখাদির জন্য প্রশংসার্হ, যে রুচিবান পরিদর্শকরা এর প্রস্তুতির জন্য দায়ী, তাঁদের কার কী বিশেষ কর্ম জানা অসম্ভব, সকলকেই আমরা সম্বর্ধিত করি। আরও কার লেখা সংগ্রহ করা চলত কিম্বা কার লেখা সংগ্রহে না থাকলেও চলত, বিচারে মতভেদ থাকবে—নির্বিচারে সব আমরাও মেনে নিতে পারি না—কিন্তু যা আমাদের প্রধান কথা তা এই—পূর্বোল্লিখিত ৩৭ খানা ছবির অ্যালবাম ও এই লেখন-সংগ্রহ গ্রন্থ বিদেশে আমাদের মুখ রক্ষা করেছে। এরূপ সংগ্রহ গ্রন্থে আমন্ত্রিত লেখকদের লেখা বিষয়ে সম্পাদকের কর্তৃত্ব সর্বাঙ্গীণ নয়, সব লেখা সমান নয়—ধর্মেও নয় রীতিতেও নয়, হতেও পারে না। অনেক লেখা উপলক্ষোচিত প্রশস্তি, কিন্তু যা ততধিক তাও সংখ্যায় সামান্য নয়। শ্রীজওহরলাল ও অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের লেখা ব্যতীত স্মৃতিকথা বিভাগের রচনার মধ্যে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর (পূরবীর 'বিজয়া'র) লেখা আছে। আলোচনা বিভাগে ভেরা ব্রিটেন, রিচার্ড চর্চ, এওার্স ওস্টারলিং প্রভৃতি লিখেছেন। প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ বিভাগে অন্তত হালডর্ লাক্সনেস্ সুবিখ্যাত নাম। এ সব মনীষীদের লেখা আপন গৌরবেই আকর্ষণীয়। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধূর্জটীপ্রসাদ কিম্বা অন্নদাশঙ্কর, পিয়ের ফালোঁ, দুশান জাভিতেল, নর্মান ব্রাউন প্রমুখ কারও কারও লেখা বাঙালী পাঠকের নিকট নতুন করে উল্লেখের প্রয়োজন রাখে না। এসব লেখা অ-বাঙালীদের (ইংরেজি পাঠক) নিকটও নিশ্চয়ই সমান আদর লাভ করবে গ্রন্থ-খণ্ডে

অ-বাঙালী ভারতীয় লেখকদের সংখ্যা আশানুরূপ নয়; তবে শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর যোশী একা সেদিকটি উজ্জ্বল করছেন। অবশ্য ভারতবাসীর যে একটি প্রবন্ধ বিশেষ করে আলোচ্য তা হচ্ছে অধ্যাপক তারকনাথ সেনের লিখিত রবীন্দ্রকাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। সুপরিণত বিচার বুদ্ধির এমন পরিচয় সুলভ নয়। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতায় কোনো ইংরেজি কবির 'কথা', কোন ফরাসী কবির 'ছায়া' কোনো জার্মান কবির 'ভাব', এসব খুঁজে খুঁজে বেড়ান—আর বোদল্যের ম্যালার্মে বলে উচ্ছ্বসিত হন—তাঁদের এ প্রবন্ধের বিচারে নিরাশ না হয়ে উপায় নেই। শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেনের সঙ্গে আমরা মুখ্যত এক মত এবং বহুদিকে তাতে উপকৃত। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই—'পাশ্চাত্ত্য' কথাটা অনেক সময়ে 'আধুনিক যুগ' অর্থে প্রযুক্ত হয়। অবশ্য সে প্রয়োগ ভ্রমাত্মক বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু কথাটা এরূপ 'আধুনিক'-এর সমার্থক বলে ধরে নিলে, একথা মানতে হবে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যবাহী হলেও ইতিহাসের সহযাত্রী। জীবনদৃষ্টিতে, জীবনবোধে তিনি আধুনিক; সাহিত্যাদর্শে ও সাহিত্য-সৃষ্টিতেও তিনি আধুনিক—যে আধুনিকতার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল পাশ্চাত্ত্য মহলে। তাঁর উপনিষদ শঙ্কর রামানুজের, এমন কি, আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যাত উপনিষদ নয়; "মানুষের ধর্ম"র ভাবনায় তা নবায়িত; তাঁর ভারতীয় সাধনাবোধও বিশ্বমানব-চেতনায় সমুদ্ভাসিত। কালিদাসকেও তিনি মল্লিনাথের দৃষ্টিতে আয়ত্ত করেন নি, এই আধুনিক মানুষের রসদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিক জীবনদৃষ্টিতে ও কাব্যাদর্শে গঠিত, ভারতীয় জীবনদৃষ্টি ও কাব্যাদর্শের ঐতিহ্যকে তা আধুনিক ধর্মে জীবন্ত করেছে। অধ্যাপক সেনের এই মূল্যবান প্রবন্ধটি বাঙলায় অনূদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আরও কয়েকটি প্রবন্ধও বিশেষ আকর্ষণীয়—যেমন, হুমায়ুন কবীর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, হিরণ সান্যাল, সুনীলচন্দ্র সরকারের মতো লেখা। সকল বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব নয়, তা না বললেও চলে। কিন্তু তা প্রণিধানযোগ্য। তবে সকলেরই নিকট বিশেষ মূল্যবান—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও ক্ষিতীশ রায় সংকলিত জীবনপঞ্জী, শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও জগদিন্দ্র ভৌমিক সংকলিত গ্রন্থপঞ্জী। এই তথ্যের বনিয়াদ না জোগালে আলোচনা-পাঠে বিদেশীয়দের অসুবিধা ঘটে—এ কথা প্রায়ই আমরা মনে রাখি না।

সাহিত্য একাদেমির পরিচালনায় যে বর্জন-ধর্ম সক্রিয় সে সম্বন্ধে সচেতন হতে হয় অধ্যাপক হীরেন মুখুজ্জের 'Himself, a True Poem' (P. P. H.

দশ টাকা) হাতে নিলেই। হীরেন মুখুজ্জে, বিষ্ণু দে, সুশোভন সরকার প্রভৃতি যে অকৃতী লেখক নন' তা একাদেমির সম্পাদকমণ্ডলী ভালো করেই জানেন; কিন্তু জাত বিচার না করে কোনো কাজ তাঁরাও করেন না। যাই হোক, ইংরেজি পাঠকরা হীরেনবাবুর থেকে এই সমুজ্জ্বল রবীন্দ্রালোচনা লাভ করে আমাদের মতোই আনন্দিত হয়েছেন। 'পরিচয়'-এ গ্রন্থের স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন। বিশেষত এ সমীক্ষায় ইংরেজি গ্রন্থাদির অপেক্ষাও বাঙলা প্রকাশনীর পরিচয় দানই অধিক কাম্য।

বাঙলা প্রকাশনীর ক্ষেত্রে নতুন রবীন্দ্র রচনাবলী ও বিশ্বভারতীর 'পল্লী-প্রকৃতি' পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের কথা পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। রবীন্দ্রালোচনার ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনকথা'ই প্রথম উল্লেখযোগ্য। এক খণ্ডের এই তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ সকলেরই পক্ষে সমান প্রয়োজনীয়। গ্রন্থ অপেক্ষা সংকলন গ্রন্থাদি প্রথম উল্লেখ করছি। প্রথম উল্লেখযোগ্য: চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'শতবার্ষিকী জয়ন্ত উৎসর্গ' (রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি: পাঁচ টাকা)—স্বভাবতই মনে করিয়ে দেয় সপ্ততি বর্ষ পূর্তির 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থের কথা, —মনে করিয়ে দেয় এই 'শতাবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসর্গ' কী হতে পারত। বর্তমান গ্রন্থে কৃতী লেখকের সমাবেশ সামান্য নয়, কিন্তু অনেক লেখা সামগ্রিক রবীন্দ্র-পরিচয়ের চেতনায় উপস্থাপিত নয়, আলোচনায় তাই খণ্ডতা থেকে যায়। বিশ্বমনা রবীন্দ্রনাথ (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রযুক্ত সার্থক বিশেষণ)-এর বোধ অনুপস্থিত। কোনো কোনো লেখাতে রবীন্দ্রচর্চা অপেক্ষা উপলক্ষানুযায়ী প্রশস্তি রচনার প্রয়াস অধিক। কোনোটিতে বা আলোচনায় অন্তর্দৃষ্টির খর্বতা। অবশ্য রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশেষ বিশেষ দিক দিয়ে সুলিখিত প্রবন্ধও এই সংকলনে আছে—নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের, মৈত্রেয়ী দেবীর ও অন্যান্যের। তথ্য সমৃদ্ধ রচনারও অভাব নেই—অধ্যাপক সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ অধ্যাপকরা যখন লেখক। সবিনয়ে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন তার বিপরীত দৃষ্টিতেই অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ইতিহাস দেখা অভিপ্রেত, তলোয়ার দিয়েই যেন ইতিহাসের খাত কাটা হয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভাবাধিক্য আছে; কিন্তু এই বিচারেই কি ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে? এই উৎসর্গের দুটি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের ও শ্রীযুক্ত

ভবতোষ দত্তের। নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও দৃষ্টির সুস্থিরতায় দুটিই সর্বথা আদরণীয় আলোচনা। কিন্তু উৎসর্গ-গ্রন্থের আরও উৎকর্ষ কাম্য ছিল।

শতবার্ষিকী সমিতি আরও দুটি ছোট বই এ উপলক্ষে প্রকাশ করেছেন—একটি শিশুদের জন্য, শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারের লেখা। আরেকটি নব-সাক্ষর বয়স্কদের জন্য অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের লেখা। শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারের অপেক্ষা যোগ্যতর লেখিকা এ ক্ষেত্রে নেই,—সাহিত্যের অনেক ক্ষেত্রেই তিনি সুযোগ্যা। কিন্তু তাঁর লেখার সরস ঔজ্জ্বল্য এই বইটিতে তেমন স্বতঃসিদ্ধ নয়—হয়তো 'সংক্ষেপের চেষ্টা' বাধা হয়ে থাকবে। শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য অপেক্ষা 'জোগাড়ে' মানুষ বাঙলা দেশে স্বল্প, তার লেখার সম্বন্ধেও এইটিই উল্লেখযোগ্য কথা। এ গ্রন্থের পাঠক সত্যই কারা, আর কী তাদের লাভ হবে জানি না।

বাঙলা সংকলনের মধ্যে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ' (দুই খণ্ড, প্রতি খণ্ড দশ টাকা; বাক্-সাহিত্য প্রকাশিত) সর্ব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। পরিকল্পনায়, উদ্যোগ-সার্থকতায়, নির্বাচনে ও অঙ্গ সজ্জায় সর্ব দিকেই সম্পাদকের সযত্ন প্রয়াসে তা সমুজ্জ্বল। প্রথম খণ্ডের বিস্তৃত পরিচয় এ পত্রে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনায় আমাদের এ ক্ষেত্রে অধিকার সীমাবদ্ধ। পুনরুক্তি হলেও বলতে হবে—প্রথম খণ্ডের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অমলেন্দু বসু, সুনীলচন্দ্র সরকার প্রভৃতি লেখকদের কোনো কোনো আলোচনা আমাদের দুইবার পড়েও আনন্দ কিছুমাত্র লাঘব হয় নি। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, ভবতোষ দত্ত প্রভৃতিদের লেখা এখনো আমাদের নিকট মূল্যবান ঠেকছে। শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশীর সাহিত্য দৃষ্টি ও বাক্-কুশলতার সঙ্গে সমুচিত বাক্-সংযম ও মাত্রাবোধ না পেয়ে একটু খেদ এখনো থেকে গেল। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধ সংখ্যা বিশটি। এখানে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আছে তিন জনের লেখা,—সমাজ-চিন্তা, রাষ্ট্র-চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে সাতটি প্রবন্ধ আছে; শিক্ষা, বিজ্ঞান, সঙ্গীত দর্শন প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে আছে আরও দশটি আলোচনা। প্রথম খণ্ডের প্রধানত আলোচ্য রবীন্দ্র-প্রতিভার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য, সেই বহুমুখী প্রতিভার চিন্তাধারার পরিচয়ই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথমেই চিত্রশিল্পের আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীশ নিয়োগী। এঁদের নামোল্লেখই যথেষ্ট। চিত্রশিল্পের মতো সঙ্গীত সৃষ্টিরও আলোচনা

আছে। আর সে আলোচনায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাস ও রাজ্যেশ্বর মিত্রের আলোচনা দুটি বিশেষ মূল্যবান। বিমলচন্দ্র সিংহের নৃত্যনাট্য বিষয়ক মনোজ্ঞ আলোচনাটি পড়তে পড়তে দীর্ঘশ্বাস পড়ে—এমন রসজ্ঞ মানুষটি কেন স্বল্পায়ু হলেন! রথীন্দ্রনাথের লেখাটি তথ্যের গুণে ও লেখার প্রাঞ্জলতায় বিশেষ মনোরম। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বিশ্বাসের 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তা' সুগ্রথিত ও সুলিখিত আলোচনা। তবে বিষয় ব্যাখ্যায় ও আলোচনার প্রাঞ্জলতায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ('রবীন্দ্র শিক্ষানীতির মূল কথা') ও পরিমল গোস্বামীর ('রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান') এই আলোচনা দুটি সর্বাপেক্ষা উপাদেয় ও সার্থক। আর, শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্তের ('আর্থিক উন্নতি ও রবীন্দ্রনাথ') ও রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের ('দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ') বিষয়ের দিক থেকে দুটি পরম প্রয়োজনীয় আলোচনা,—বিষয়ের জটিলতা যে পণ্ডিত লেখকদের বাধা হয় নি, তাতেই তাঁদের সার্থকতা প্রমাণিত। আসলে এ সংকলনের প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সর্বগ্রাহ্য না হোক সর্বপাঠ্য। রবীন্দ্র-আলোচনায় ভবিষ্যতেও আলোচ্য হয়ে থাকবে। ঋষিঋণ স্বীকৃতিতে পুলিন সেনও আমাদের সকলের মুখপাত্র হয়ে থাকবেন—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে।

'রবীন্দ্রনাথ-শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন' (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, পাঁচ টাকা) সম্বন্ধে পুনরুল্লেখ আমাদের পক্ষে সুসঙ্গত নয়। করতে হচ্ছে কারণ অনেকেরই বিবেচনায় এ সঙ্কলন মূল্যবান, এক দিক থেকে বিশিষ্টও। আমাদের মনে হয়েছে, ভবিষ্যৎ সংস্করণে রবীন্দ্র সঙ্গীতের আলোচনা শুদ্ধ এ সংকলনে কবির সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজন প্রয়োজন। আরও একটু শোধন পরিমার্জনও অসাধ্য নয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ধারায় শ্রীযুক্ত আদিত্য ওহদেদার ইতিপূর্বেই একটি প্রয়োজনীয় কাজ আরম্ভ করেছিলেন। সে ধারার একখানি সংকলন গ্রন্থ 'রবীন্দ্রবিতান' (এ মুখার্জি কোং প্রকাশিত, পাঁচ টাকা)। শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত রবীন্দ্র সমসাময়িক সাহিত্যিক ও লেখকদের রবীন্দ্রালোচনা ও সমালোচনা থেকে সেদিনের বাঙলা সাহিত্যের পরিবেশের একটি আবশ্যকীয় পরিচয় পাওয়া যায়, আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-প্রতিভারও বিস্ময়করতার কথা উপলব্ধি করা যায়। 'রবীন্দ্রবিতান'-এ নোবল পারিতোষিক প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত (১৮৭৮—১৯১৩ ইং) এরূপ

রবীন্দ্রালোচনার ছাব্বিশটি নিদর্শন সংকলিত হয়েছে—সম্পাদকের একটি সুন্দর ভূমিকাসহ। প্রত্যেকটিই পরিবেশ অনুমানের পক্ষে মূল্যবান, কোনো কোনোটি, প্রশস্তিই হোক বা বিরূপ সমালোচনাই হোক, রবীন্দ্রালোচনায় অপরিহার্য—প্রিয়নাথ সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখদের প্রাসঙ্গিক লেখা এভাবে এক সঙ্গে উপস্থাপিত করে জিজ্ঞাসুদেরও বিশেষ উপকার সাধন করা হয়েছে। এই সঙ্কলনের পরিশিষ্টে ইংরেজিতে লিখিত আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ইং ১৮৯১ সালের আলোচনা ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ইং ১৯০০-তে লিখিত আলোচনা প্রভৃতি পুনর্মুদ্রিত করাতে কী বাধা ছিল? ইংরেজিতে হলেও তা বাঙলা সাহিত্যেরই কথা। অনেকটা 'রবীন্দ্র বিতান'-জাতীয় আর একখানা সঙ্কলন গ্রন্থ 'রবীন্দ্রবীক্ষা' (এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, বারো টাকা) বইখানি এক হিসাবে পূর্ব সঙ্কলনের পরিপূরকও বটে। তার 'পূর্বভাগ'-এ (১-১৩৩ পৃঃ) আছে দুষ্প্রাপ্য রবীন্দ্ররচনা সংকলন ও ধর্ম-বিতর্ক, রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিষয়ক রচনাসমূহ, আর বঙ্কিম-রবীন্দ্র বিতর্কের ('প্রচার', 'নববিধান' 'তত্ত্ববোধিনী'তে বাংলা ১২৯১ সালের বিতর্ক) প্রয়োজনীয় প্রধান লেখা কয়টি। 'উত্তরভাগ'-এ (১-২৩২ পৃঃ) অবনীন্দ্রনাথ থেকে ভবানী সেন (১৯৬১) পর্যন্ত আঠারো জন লেখকের রবীন্দ্রবিষয়ক এক একটি প্রবন্ধ। সব কয়টি আলোচনাই উল্লেখযোগ্য। ইন্দিরা দেবী, মোহিতলাল মজুমদার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কারও কারও প্রবন্ধ দুষ্প্রাপ্য না হলেও বাঙলা সাহিত্যে স্মরণীয়। এক-আধটি (যেমন, শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়ের রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা বিষয়ক) আলোচনা যেন অনুরোধ রক্ষা (?); এত সংক্ষিপ্ত যে তাতে আলোচনা ফুটে উঠতে পারে না। 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা' বিষয়ে সার্থক আলোচনা এবার না হয়েছে তা নয় (যেমন, শ্রীযুক্ত চিন্মোহন সেহানবিশের প্রবন্ধ পূর্বেকার সংকলনে, ও তথ্যোদ্ধৃতি 'আন্তর্জাতিক' মাসিক পত্রের রবীন্দ্রসংখ্যায়)। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন সেন সাহিত্য দৃষ্টিতে ও লেখা নির্বাচনে নিষ্ঠা ও যত্ন নিয়েছেন। একটি ত্রুটি রেখে দিলেন কেন? প্রবন্ধ সমূহের রচনাকাল (ও সূত্র, পত্রিকা, গ্রন্থাদির নাম) কেন উল্লেখ করলেন না?

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং হাউসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীযুক্ত বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'কবি প্রণাম' (পাঁচ

টাকা), বাঙালী কবিদের প্রণাম ; বাঙলা কবিতারও রূপ-বৈচিত্র্যের তা পরিচায়ক, রূপ-বৈপরীত্যের ও রূপ-হানির লক্ষণও তাতে দেখা না যায় এমন নয়।

নানা কারণে আর একটি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য—এলাহাবাদের শতবার্ষিক উৎসব কমিটির প্রকাশিত 'রবীন্দ্রপ্রবাহ'—বাঙলা, ইংরেজি ও হিন্দী তিন ভাষাতেই প্রবন্ধ ও আলোচনাদি এ গ্রন্থে সংগৃহীত ও সম্পাদিত হয়েছে—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব ও শ্রীযুক্ত তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তীর যত্নে। রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুবাদও আছে হিন্দী ও ইংরেজিতে। এ আয়োজনের যাঁরা ব্যবস্থা করেছেন তাঁদেরকে অভিনন্দন করতে হবে।

ইচ্ছা করেই দুখানা সংকলন গ্রন্থের কথা শেষে উল্লেখ করছি—দু'খানাই উৎকৃষ্ট পর্যায়ের। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য (নিজেও অন্যত্র আলোচনা করেছেন) অধ্যাপক সমিতির পক্ষ থেকে সম্পাদনা করেন 'রবীন্দ্রনাথ' (ইষ্ট লাইট বুক হাউস, দশ টাকা)। সম্পাদনার কৃতিত্ব যথেষ্ট, এবং সম্পাদকের নিজের আলোচিত 'চরিত সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ'ও একটি সুলিখিত ও সার্থক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসুর চমৎকার আলোচনা, শ্রীযুক্ত সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রকলা সম্পর্কিত আলোচনা সুধীরচন্দ্র রায়ের শিক্ষা বিষয়ক ও প্রিয়তোষ মৈত্রেয়-এর অর্থনীতি সম্পর্কিত রবীন্দ্রালোচনা নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে। জীবন চৌধুরীর সাহিত্য দর্শন ও শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ ও অমরতা' বিষয়ক প্রবন্ধ গভীর চিন্তা ও বিচার বুদ্ধিতে সুপরিণত। সঙ্কলন পরিকল্পনানুযায়ী সর্বাঙ্গীণ না হয়ে ওঠার ত্রুটি অনেক সময়ে সম্পাদকের নয়—বরং এ বৎসরে যোগ্য লেখকদের উপর লেখার জন্য অতিরিক্ত চাপ। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যবান বক্তব্য একাধিক ক্ষেত্রে মুদ্রিত হওয়ায় একটা উপকার হয়েছে—সহজে তা সকল পাঠকদের লভ্য হবে। কিন্তু অন্য অনেক লেখকদের বক্তব্য তত গুরুতর নয় ; ইংরেজির বদলে বাঙলা, বা এক বাঙলার বদলে শব্দান্তরে অন্য বাঙলায় তা সাজিয়ে দেবার প্রয়োজন বেশি নেই। অনেক সংকলনেই অনেক কৃতী মানুষের প্রায় একই কথা এভাবে বারবার পরিবেশিত হতে দেখেছি। অধ্যাপক সমিতির সঙ্কলনে আমরা যা লাভ করেছি তার জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু বলতে বাধ্য—প্রত্যাশা ছিল আরও অধিক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও একটা গলদ এখন এমন পুঞ্জিত যে সম্ভবত তা এখন

নিঃশ্বাস ফেলতেও অক্ষম। তা বুঝতে পারি যখন তার রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের আয়োজন-দৈন্য দেখি। বাঙলা বিভাগ ও অন্য কোনো কোনো বিভাগের অধ্যাপকরা নিজ কর্ম বিস্মৃত হন নি। কিন্তু সমগ্রভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে কী করেছেন, তার হিসাব দেখা যায় তার সমাবর্তন উৎসব নিবেদনে। যথা, রবীন্দ্র অধ্যাপক 'ভবিষ্যতে' নিযুক্ত হবে ; এ বৎসর কিছু উৎসবও (অনির্দিষ্ট) হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র উপাচার্য সিদ্ধান্ত মহাশয়ের উৎসাহে প্রারব্ধ (ভাতঘরায়) ছাত্রদের পল্লী-সংগঠন কর্মের, আর স্নাতকোত্তর ছাত্র সমিতির প্রকাশিত সংকলনের। সত্যই এই কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মাত্র চেষ্টা ? তা হলে তা পশ্চিম বাংলা সরকারকেও এই সাংস্কৃতিক নিরঙ্কুশতায় হার মানিয়েছে। অর্থাৎ গভীর অর্থেই এ কথা সত্য—পুরনো সিনেট হাউস ভাঙতেই তাঁরা জানেন, গড়া তাঁদের সাধ্য হবে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (বাইরের ও ভিতরের বাধায়) রবীন্দ্রনাথকে সমাদর করতে শিখেছে বিলম্বে। সে সমাদর অকুণ্ঠিত হয়েছিল স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায়—অনেক দিকেই সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংস্কৃতির সাধনার কেন্দ্র হতে চলেছিল—রবীন্দ্রনাথকে নিজের অধ্যাপকরূপে তখন বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বান করেছে, বাঙলা ভাষার প্রথম তাঁর সমাবর্তন উৎসব অভিভাষণ পরিবেশন করিয়েছে, আর সে সূত্রে এমন গৌরবের অধিকারীও হয়েছে যার জন্য ইতিহাসে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমাবর্তন অভিভাষণ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অন্তত আত্মগরিমাবোধও কি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই ?

এই ক্ষোভ মন থেকে অনেকাংশে মুছে যায় যখন স্নাতকোত্তর ছাত্র সমিতির মুখপত্র 'একতা'-র রবীন্দ্র সংখ্যা আমরা খুলে বসি। এ সংখ্যার পরিচালকেরা এখনো ছাত্র, লেখকরাও অনেকেই তাই, অনেকে ছাত্রজীবন শেষে কর্মজীবনে সদ্য-প্রবিষ্ট। আর বেদনার সঙ্গে স্বীকার করি—অনেক সময়েই আজকের ছাত্রদের অনেক আয়োজন উদ্যোগে আমরা উৎসাহহীন। এরূপ সময়ে 'একতা'-র এই রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যাটি হাত পেয়ে পূর্বেকার মতোই আবার মনে এই আক্ষেপই জাগল—আবাদ করলে ফলত সোনা। এমনি উর্বর, এমন স্বর্ণপ্রসূ ভূমি বুঝি আর কোনো দেশে নেই—বাঙলা দেশের যৌবনের মতো। কিন্তু তা কতটা আবাদ হচ্ছে ? আর কীই বা হচ্ছে তাতে আবাদ ?

অভিনন্দনযোগ্য 'একতা'-র পরিকল্পনা : 'রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়' (কেশব চক্রবর্তী লিখিত) নামক তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ দিয়ে তার প্রস্তাবনা। 'রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ' (লেখক—ভাস্কর বসু), 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' (লেখক—অরুণ সেন), 'প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ' (লেখক—নির্মাল্য আচার্য), দিয়ে তার পারিপার্শ্বিক বর্ণিত। তারপর, এক-একটি বিশেষ দিকের আলোচনা—'রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় শিক্ষা সমাজ' (লেখক—অশোক মুখোপাধ্যায়), 'রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চিন্তা' (লেখক—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়), 'রবীন্দ্রমন ও দার্শনিক দ্বন্দ্ব' (লেখক—বিজন পুরকায়স্থ), 'কাণ্ট ও রবীন্দ্রনাথ' (লেখক—দেবব্রত চক্রবর্তী) প্রভৃতি দশটি সুচিন্তিত আলোচনা। পর বিভাগে 'শিশুতীর্থ খ্রীষ্ট পুরাণের নব রূপান্তর' (লেখক—শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়), 'শেষের কবিতা' (লেখক—সরোজ চৌধুরী) প্রভৃতি দশ-এগারোটি বিশেষ গ্রন্থ বা রবীন্দ্রকৃতি বিষয়ক সুষ্ঠু আলোচনা, এর মধ্যে আছে দুটি চিত্রকলাসম্পর্কিত। শেষ পর্বে আলোচ্য রবীন্দ্রের কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, চিত্রকলা প্রভৃতি। এ বিভাগের ছয়টি লেখা নিশ্চয়ই সাহসের ও আত্মজিজ্ঞাসার প্রমাণ, আগামীর আভাস। পরিশেষে সম্পাদক এ বৎসরের সত্যজিৎ রায় প্রযোজিত প্রামাণ্য চিত্র ও 'রবীন্দ্রায়ণ', 'রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি কয়েকটি পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের আলোচনা করে বাঙলা বিভাগ শেষ করেছেন। ইংরেজি বিভাগেও চারটি প্রবন্ধ। তাছাড়া সাত-আটটি করে লেখা (কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি) রয়েছে। হিন্দী ও উর্দু বিভাগেও—কিন্তু শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব' (ইংরেজি) ব্যতীত সব কয়টি লেখাই ক্ষুদ্র। সর্বশুদ্ধ এই একাধিক ভাষায় আলোচনার ব্যবস্থাপনা প্রশংসনীয়। আর অভিনন্দনযোগ্য সর্বব্যাপী পরিকল্পনানুযায়ী এই প্রযোজনা, প্রবন্ধ-সংগ্রহ ও পরিবেশন।

ঠিক এরূপই সুশিক্ষিত এ সঙ্কলনের প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধ। আমরা এর কয়েকটি প্রবন্ধের বিশদ আলোচনা করবার মতো অবকাশ না পেয়ে দুঃখিত। কারণ, সত্যই চিন্তায়, অন্তর্দৃষ্টিতে, পরিশ্রমে, দায়িত্বচেতনায় লেখকদের তা কৃতিত্বসূচক। আমাদের আনন্দদায়ক শুধু নয়—আশার কারণ। এমন সুদক্ষতার সঙ্গে যাঁরা দার্শনিক বিচার (দেবব্রত চক্রবর্তী ও বিজন পুরকায়স্থের মতো) করতে পারেন, সাহিত্যবিচার (শিশিরকুমার দাশ, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতো) করতে জানেন, সমসাময়িক জীবন ও শিল্পকৃতির পরীক্ষায় (দেবেশ রায়, সুবীর রায়চৌধুরী প্রভৃতির

মতো) সক্ষম—বাঙলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের তাঁরা প্রতিশ্রুতি। এঁরা কেউ-কেউ এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, বানিক রায়, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছাত্রজীবনোত্তীর্ণ এবং সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁদের আলোচনায় বিস্ময় তত অপ্রত্যাশিত নয়। তাঁদের বিষয়ে বেশি আলোচনা তাই বাহুল্য। সবশুদ্ধ এই লেখকদের একত্র সমাবেশ একটা কৃতিত্ব। তবে অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিচিতদের প্রয়াসই আমাদের নিকট সর্বাধিক আশার কারণ। আর ঠিক এই দুই কারণেই সমালোচনা করব তাদের যাঁদের লেখায় দেখছি ত্রুটি—নিষ্ঠার বা পরিশ্রমের অভাব। একটা বয়সে ভাবের বা ভাষার চমক লাগাবার লোভ অমার্জনীয় নয়, তবু তা বর্জনীয়। এজন্যই রবীন্দ্রোত্তর কবিতার আলোচনা, এমন কি, ভাবনার ও ভাষার অনিশ্চয়তার জন্য নাট্যমুহূর্ত ও ভাষার সন্ধান পর্যন্ত আমাদের আশানুরূপ তৃপ্তি দান করে নি। দ্বিতীয় কথা—কোনো কোনো আলোচনায় চিন্তার গভীরতা থাকলেও আমরা ভাষার স্বচ্ছতা পাই নি। যে ছাত্রসমাজ প্রমথ চৌধুরীকে নিয়ে গৌরব করেন তাঁরা বিস্মৃত হন কি করে গদ্যশৈলীর (আনাতোল ফ্রাঁসের ভাষায়) তিনটি প্রধান গুণ—প্রথম স্বচ্ছতা, দ্বিতীয় স্বচ্ছতা, সর্বশেষ স্বচ্ছতা।

যারা উদীয়মান তাদের কাছেই আমাদের আশা—তাই এই সমালোচনা, অভিনন্দনের সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, তাও এই সঙ্কলনের গ্রহণীয়। প্রত্যেক মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রই বিশেষাঙ্ক প্রকাশ করেছেন। কেউ-কেউ সেদিকে বিশেষ উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছেন। বড়দের কথা নিরর্থক, যা ঠিক সর্ববহ নয়, তেমন সাময়িক পত্রের মধ্যেও আমাদের মনে পড়ছে 'নতুন সাহিত্য'-এর কথা, 'আন্তর্জাতিক'-এর কথা এবং 'উত্তরসূরী'র কথা—'স্বাধীনতা'র মতো দৈনিকগুলি তাদের বৎসরব্যাপী প্রকাশিত এ জাতীয় লেখার সঙ্কলন বা তদভাবে সংক্ষিপ্ত সূচী প্রকাশ করবেন, তাও আমরা আশা করি। অবশ্য স্মারক গ্রন্থসমূহের সূচী কেউ রচনা করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

যা ইচ্ছা থাকলেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা অসম্ভব হল তা হচ্ছে এ বৎসরে প্রকাশিত রবীন্দ্রালোচনা গ্রন্থসমূহ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবন কথা' প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে—তাই যথেষ্ট। কিন্তু নব-প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে দু-একখানির জন্য আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকব—

তার মধ্যে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ' (এ. মুখার্জি ; সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা) অন্তত আমাদের প্রথম মনে পড়ছে। লেখকের নিষ্ঠা, সততা, গভীর দৃষ্টির জন্য তাঁর আলোচনা আমাদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। তাঁর বক্তব্যও প্রায় সর্বত্রই গ্রাহ্য। সজনীকান্ত দাসের 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' নিশ্চয়ই তথ্য ও আলোচনার জন্য উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত কানাই সামন্তের 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' (দশ টাকা) কিন্তু লেখকের নিকট আমাদের ওদিকে যতখানি প্রত্যাশা তা পূরণ করে নি। 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ' 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' লেখিকার (শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবীর) পরিশ্রম ও নিষ্ঠারও সুন্দর প্রমাণ ; শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'বাইশে শ্রাবণ' একটু পূর্বে প্রকাশিত হলেও এখনো স্মরণীয় নতুন বই। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের 'রবিচ্ছবি'তেও (মূল্য ছয় টাকা) নূতন সংবাদ ও নূতন তথ্য আছে। সোমেন্দ্রনাথ বসুর 'রবীন্দ্র অভিধানের' পরবর্তী খণ্ডের জন্য আমরা এখনো অপেক্ষা করছি। একাধিক লোক এরূপ রবীন্দ্রকোষ লেখায় যত্নপর হয়েছেন বলে শুনেছি। হয়তো যোগ্য লোকদের একটি কমিটি এ কাজ হাতে নিলে তা অধিকতর সুফলদায়ক হতো। অথবা 'ভারতকোষ'-এর কথা শুনে মনে হয়—কি হতো কে জানে। একসঙ্গে অকাজ করতে আমরা যতটা পটু কাজ করতে যে ততটাই অক্ষম—বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথের এই অভিজ্ঞতা তো এখনো মিথ্যা হয় নি। এই প্রসঙ্গেই তাই মনে পড়ে—এখনো কত বাকী। একমাত্র সৃজনমূলক সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনো সৃজনমূলক আয়োজনই এ যুগে একা করা যায় না।

এইবার তাই শেষ কথায় আসি। মোটামুটি এ শতবর্ষ উৎসবের সমস্ত অনুষ্ঠান ও প্রয়াস থেকে আমরা আর একবার বলি—'অল্ ইজ নট্ লস্ট্'। আর তাই এখন একবার যা বাকী, যা অবশ্য কার্য, তেমনি আরও দুয়েকটি বিষয়ের কথা স্মরণ করি :

প্রয়োজনের দিক থেকে কয়েকটি প্রস্তাব আমাদের এখনো আছে। (১) রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি সকল পাঠশুদ্ধ সংস্করণ (Varioram Edition) প্রস্তুত করা। এ কথা পূর্বেও আমরা বলেছি। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসু পত্রান্তরে সুচিন্তিত প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, দেখে আমরা আনন্দিত হলাম। এখানে তাই প্রস্তাবটি বিশদ করা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও কানাই সামন্ত

প্রমুখ রবীন্দ্রসাহিত্যকাণ্ডারীরা এ কর্মভার গ্রহণ করতে পারবেন,—কিন্তু ভার তাঁদের অর্পণ করবে কে—বিশ্বভারতী না, রবীন্দ্রভারতী, না কোনো সরকার? (২) অবশ্য রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী ও চিত্রপঞ্জীও যে তৎপূর্বেই সযত্নে প্রণীত হবে, আমরা তা আশা করি। (৩) শুনেছি শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিকল্পনায় রবীন্দ্রদিনপঞ্জী সঙ্কলিত হচ্ছে—আশা করি, তাঁর পথ নিষ্কণ্টক। (৪) 'রবীন্দ্রভারতী' রবীন্দ্রসাহিত্য ও নৃত্যনাট্য প্রভৃতির প্রতিষ্ঠানসমূহকে কীভাবে সংযুক্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত করবেন তাও এখন দ্রষ্টব্য। বলেছি একযোগে কাজ না করলে অনেক ক্ষেত্রেই অরাজকতা দেখা দেবে। (৫) বৎসরে একবার শান্তি উৎসব কমিটির আয়োজিত রবীন্দ্রমেলার মতো একটি রবীন্দ্রমেলার ব্যবস্থা এ সমিতি করবার কথা ভাবছেন, শুনেছি। নিশ্চয়ই এরূপ মেলার প্রয়োজন সকলেই অনুভব করেন। (৬) রবীন্দ্র গবেষণার আসর হিসাবে একটি সাময়িক পত্র (বার্ষিক দুই বা তিন সংখ্যার) প্রকাশ একান্ত বাঞ্ছনীয়—রবীন্দ্রায়ণ, রবীন্দ্রায়তন, রবিসত্র, রবীন্দ্রচর্চা—যাই হোক তার নাম। শেক্স্পীয়র স্টাডিজ-এর মতো রবীন্দ্রচর্চার তা আয়তন হতে পারে। (৭) শিক্ষাবিষয়ক গবেষণার জন্য প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের নামে সঙ্কলিত একটি উচ্চতর গবেষণাকেন্দ্রের (সোভিয়েত প্রভৃতি দেশের পেডাগজিক ইন্‌স্টিউটের মতো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য হয় এরূপ প্রতিষ্ঠান)। (৮) জনশিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা। (৯) পল্লীসেবার জন্য বিশেষ আয়োজন, (১০) সমবায় নীতির বিস্তারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ এখনো অবহেলিত হলে রবীন্দ্র উৎসব পালন যে ব্যর্থ হয়ে থাকবে তা আবার না বললেও চলে।

অবশ্য সর্বাপেক্ষা বড় কামনা—রবীন্দ্রঐতিহ্য বা রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতাবোধ, তাঁর মানবতাবোধ, তাঁর সর্বমুখী জীবনানুরাগ—আমাদের জীবনে ফলপ্রসূ হোক, নব নব সৃজনপ্রয়াসে চিরজীবী হয়ে উঠুক! আমরা যাতে রবীন্দ্রনাথের জাতির মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারি।

গোপাল হালদার


আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
দু' ড্রাম মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি,
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক
ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও
বলকারক টনিক দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং সবলদেহ
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।
সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
Mritusanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম,বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়াবাগান স্ট্রীট রোড, কলিকাতা-৬
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

দাম : এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা



জ্যৈষ্ঠ • ১৩৬৯